# বাতায়ন

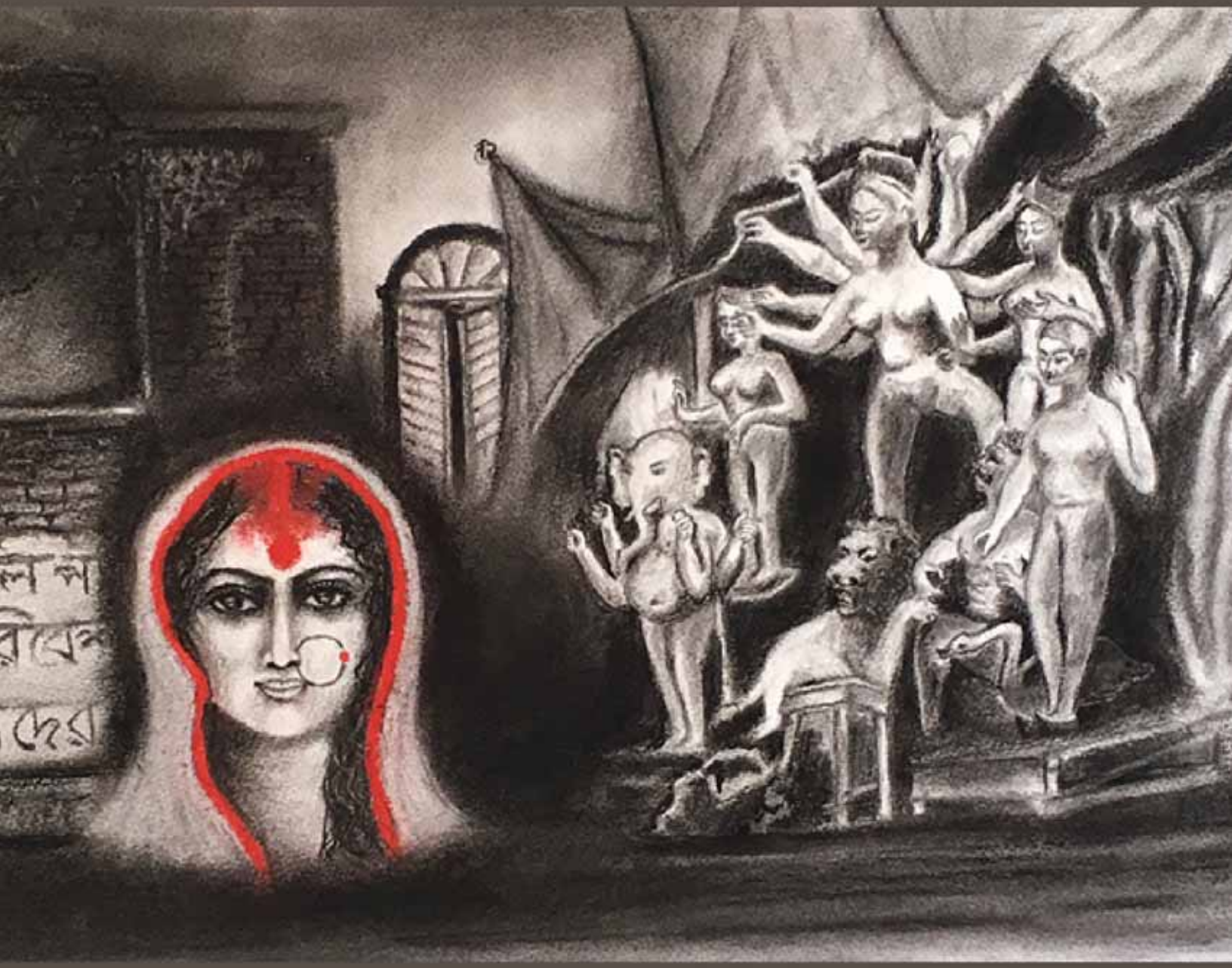

Batayan

শুভ কামনা

পৃথিবীর সাত-সাতটা আশ্চর্যই খুব বড় ।
ছোট আশ্চর্য বলতে কেবল এই কবিতা
যা আমি তোমাকে দিতে পারি ।

– শ্রীজাত

Batayan

বাতায়ন

# সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে

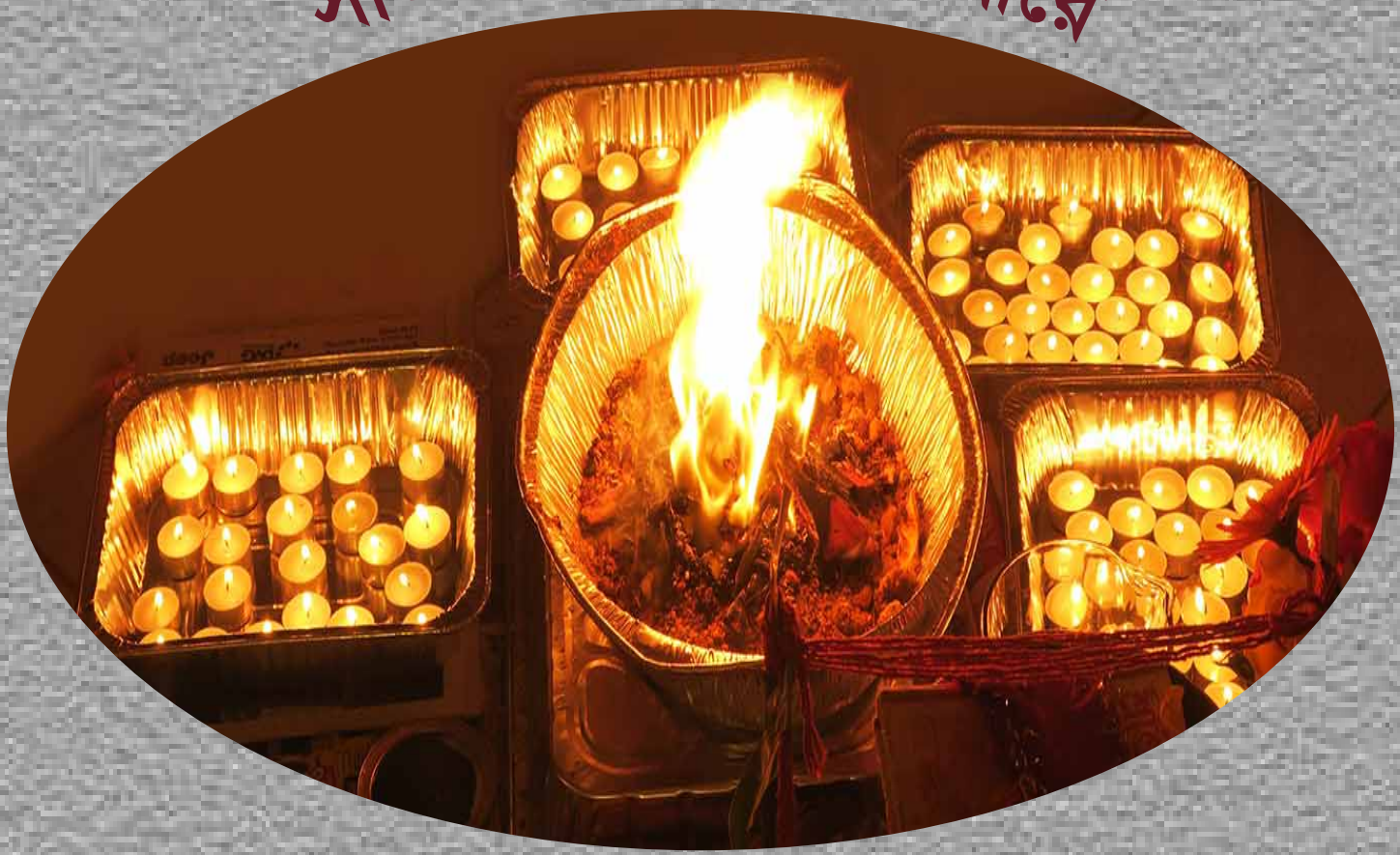

অষ্টাদশ সংখ্যা, অক্টোবর, ২০১৯

সম্পাদনা

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

Issue Number 18 : October, 2019

**Editors**
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)

**Coordinator**
Manas Ghosh, Kolkata, India
Snehasis Bhattacharjee, Kolkata, India

**Networking & Communication**
Biswajit Matilal, Kolkata, India

**Design & Art Layout**
Kajal & Subrata, Kolkata, India

**Website Support**
Susanta Nandi, India

**Published By**
**BATAYAN INCORPORATED**
**Western Australia**
**Registered No. : A1022301D**
E-mail: info@batayan.org
**www.batayan.org**

**Production & Management**
Anusri Banerjee

## PHOTO CREDIT

**Partha Pratim Ghosh** **Aagomoni Painting : Front Cover**

As a Civil Engineering Graduate from Bengal Engineering College, Shibpur and a Professional Engineer (PE) of Pennsylvania, USA. I practiced Engineering for 52 years in USA, Canada and in India. Moved back to Kolkata from USA in 1987. Pursuing Painting as a hobby very passionately and with dedication. Organizing exhibition of my artwork every year in January, since 2014.

**তনিমা বসু** **Fall colors in Michigan : Front Inside Cover**

**তনিমা বসু**, পদার্থ বিদ্যায় স্নাতক । ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সুযোগ করে দিয়েছে সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে অন্তর্হিত সত্য উদ্‌ঘাটন করার । বিজ্ঞানের ছাত্রীর অবসর সময় কাটে কাগজে আকিঁবুকি করে, বিভিন্ন মিডিয়ামের সাথে পরিচিত হয়ে – কখনো কাগজে, কখনো স্ক্রিনে । ভালোবাসে ছবি তুলতে রঙীন প্রকৃতির এবং আপনজনদের ।

**Batayan "SANKALAN"** **Back Inside Cover**
**Press release at Kolkata Press Club**

**Suranjana Chattopadhyay, IL, US** **Back Cover**

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

# সম্পাদকীয়

সময়ের অন্তহীন আবর্তনের মধ্যে আবর্তনের নিয়মেই এক উৎসব আসে, আর এক উৎসব শেষ হয়। এক ঋতু আসে, অন্য ঋতু যায়। ঋতুচক্রের আবর্তনের হিসাবমতো বাংলায় এখন হেমন্তকাল। মার্কিন মুলুকে এই সময়টাকে বলে 'fall' – পাতা ঝরার সময়। ঝরে যাওয়ার আগে ভারী সুন্দর সাজে সেজে ওঠে গাছেরা। কোন কোন গাছ যেন মা দুর্গার ভাসানের সময় সিঁদুর রাঙানো মেয়ে বৌয়ের মতো। যেমন লাল টুকটুকে পাতাওলা মেপল গাছগুলো। কোনটা আবার আগুনরঙা। কখনো পড়ন্ত রোদের আলোয় যেন মনে হয় লক্ষ প্রদীপ জ্বলছে সে গাছে। গাছেরাও কি টের পায় যে দীপাবলী আসন্ন ? অবসাদ মুছে ফেলে এখন আলো জ্বালানোর সময় ? হয় তো ! পরিযায়ী পাখীদেরও বোধহয় আসন্ন দীর্ঘ সফরের প্রস্তুতি চলছে ভিতরে ভিতরে।

প্রকৃতি, সমাজ-সংসার, জীবন – কিছুই থেমে থাকে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুর পরিবর্তন হয়। সেই পরিবর্তনকে স্বীকার করে পথ চলাই প্রাণের চিহ্ন। শুধু কালভেদে নয়, জীবনের যাপন বদলায় স্থানভেদেও। আমেরিকার শিকাগো শহরে সবেমাত্র দুর্গাপুজো শেষ হল। সপ্তাহান্তের আড়াই দিনে বোধন থেকে বিসর্জন। তার সঙ্গে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুজো পত্রিকা, খাওয়াদাওয়া, ধুনুচি নাচ, সিঁদুর খেলা – সব আছে। আছে নতুন জামা কাপড়ে সেজে পূজামণ্ডপে যাওয়ার আগ্রহ। রাস্তা ঘাটে আলোর বন্যায় ভাসতে ভাসতে যাওয়ার সুযোগ নেই ঠিকই তবে আনন্দের ভাগে কম পড়ে না তাতে। একই প্রতিমায় বছর বছর পুজো। বিসর্জনের দিন সামনে লরিতে প্রতিমা আর তার পিছনে নাচতে নাচতে চলা ছেলে বুড়োর দল এই প্রবাসে শুধু স্মৃতিতে। কিন্তু তাও ঘট বিসর্জন হয়ে গেলে যখন ড্রাম আর কাঁসরের তালে তালে লাল পাড় সাদা শাড়ীদের নাচ শুরু হয় তখন মনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে, "বলো দুগ্গা মায়ি কি জয়" "আসছে বছর আবার হবে।" ঢাক নেই তো কি হয়েছে, ড্রামেই ওঠে ঢাকের বোল। নানা পরিবর্তনের হাত ধরে দূর প্রবাসে দুর্গোৎসবের উদযাপন বেশ হৈ হৈ করে হয়। এবার আসছে দীপাবলীর উৎসব।

এরই মধ্যে নানারকম রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে চলেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। অভিজিৎ ব্যানার্জী নোবেল পুরস্কার পেলেন অর্থনীতিতে। তাঁর আবিষ্কার ভবিষ্যতের বিশ্বে পরিবর্তন আনতে চলেছে এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। বদলে যাচ্ছে আমাদের গ্রহের বায়ুমণ্ডলের আবহাওয়া – বেশ দ্রুতগতিতে আর নেতিবাচক দিকে। যোগাযোগ মাধ্যম এর সহজ ব্যবহারের ফলে এক দেশের মানুষের সঙ্গে আর এক দেশের মানুষের বোঝাপড়া হচ্ছে। আবার একাকিত্বও বেড়ে চলেছে। রং বদলের পালা চলেছে জীবনের বিভিন্ন দিকে।

এই পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখি বিভিন্ন শিল্পেও। অনেক সময় শিল্প মাধ্যমে শিল্পীর চারপাশের জীবনযাপনের ছবি বেশ স্পষ্টভাবে আঁকা হয়ে যায়। সাহিত্য শব্দ নির্ভর শিল্প মাধ্যম। তাই প্রায়ই একটা বিশেষ যুগের চিন্তা ভাবনার রূপরেখা

ধরা পড়ে সাহিত্যে। এ কথা দেশ বিদেশের কালজয়ী সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য তেমনই শখের সাহিত্যচর্চাকারীদের লেখার ক্ষেত্রেও সত্যি। আর তা ধরা দেয় নানাভাবে। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে,ভাষার ব্যবহারে, চরিত্রচিত্রণে, কখনো বা সংলাপের ব্যবহারে ফুটে ওঠে সে সব।

বাতায়ন অক্টোবর বৈদ্যুতিন সংখ্যা প্রধানতঃ গল্প আর কবিতায় সাজান। এক একটি ছোটগল্প যে শুধু এক এক স্বাদের তাই নয় – গল্পগুলোয় বর্তমান সময়ের ছাপ বেশ স্পষ্ট। এমনকি যে সব গল্পের বিষয়বস্তু পৌরাণিককাহিনী সেখানেও গল্পকারের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্যণীয়। কেন এবং কিভাবে তার নির্ণয় করবেন পাঠকেরা। ইতিমধ্যে বাতায়ন সংকলন সংখ্যা পৌঁছে গেছে অনেকের হাতে। পুজোর আগে বাতায়ন পত্রিকার পক্ষ থেকে পুজোর উপহার। আশা করি ভালো লেগেছে। এই সংখ্যাটি কেমন লাগলো তা জানার অপেক্ষায় থাকবো। উৎসবকালীন শুভেচ্ছা সহ,

**রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়**
শিকাগো, ইলিনয়
বাতায়ন সম্পাদিকা, বাংলা বিভাগ

---

# শুভেচ্ছা

## বাতায়নের বিশেষ পাতুয়া

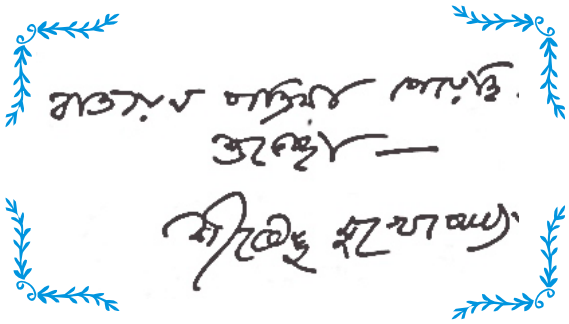

Batayan pelam. Very good and unique venture..

Thanks

Swapnamoy Chakraborty

পত্রিকা পেয়েছি, ধন্যবাদ ।
প্রায় পড়াও হয়ে গেছে।

নবকুমার বসু

---

# সূচীপত্র

**যশোধরা রায়চৌধুরী**

বুদবুদের কবিতা ৫

ভাল ও খারাপ ৫

**উপাসনা সরকার**

উষ্ণতা - ১ ৬

উষ্ণতা - ২ ৬

**রবিরশ্মি ঘোষ**

হারিয়ে যাওয়া আমি ৭

**ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত**

হে ক্ষণিকের অতিথি ৮

**মমতা দাস (ভট্টাচার্য)**

মৃত্যু চিহ্ন ৯

**সৌমিত্র চক্রবর্তী**

এখন যেরকম ৯

**সঞ্জয় চক্রবর্তী**

তিস্তার মতো মেয়ে ১০

বেকার কবিতা ১০

**দেব বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রবাহ ১১

**মানস ঘোষ**

অরূপকথা ১২

**স্নেহাশিস ভট্টাচার্য**

ঘষা কাঁচ ১৩

**রুবাইয়া জেসমিন (জুঁই)**

উদ্বাস্তু ১৪

**জয়তী রায়**

পৌরাণিক গল্প – কৈকেয়ী কথন ১৫

**রজত ভট্টাচার্য্য**

অভিজ্ঞান-মালতী ২১

**সাগরিকা রায়**

শীতের গোলাপ ২৯

**ইন্দ্রাণী দত্ত**

পরীছাঁট ৩৫

**মৈনাক চৌধুরী**

পৈতৃক ৩৯

# সূচীপত্র

**শাশ্বতী বসু**
মাতৃ রূপেন ..... ৪৪

**পবিত্র চক্রবর্তী**
মন্দোদরী ও দশগ্রীবের শেষ রাত ৫০

**আলপনা গুহ**
এক্কা দোক্কা ৫৫

**তপনজ্যোতি মিত্র**
উপত্যকার গল্প ৬০

**ইন্দিরা চন্দ**
ত্রয়ী ৬৪

**পারিজাত ব্যানার্জী**
“কলকাতা, তোরেই হৃদয়মাঝে রাখি” ৬৫

**সুজয় দত্ত**
বিশ্বপরিক্রমা ৭০

# যশোধরা রায়চৌধুরী

## বুদবুদের কবিতা

আকাট, আশ্চর্য দিন। গতিহীন, ভাবনার টুকরো সব কোলাজে মলিন।
আর অন্যদিকে এই স্মৃতিক্লিষ্ট অতীতচারণ।
মধ্যে শুধু গড়ে উঠছে ভেঙে যাচ্ছে মুহূর্তেরা, নতুন, সঞ্চয়ী।
কেউ যদি বলে আয়, দেখাব তোকে ত, জীবনের
প্রচুর বালির মধ্যে ছিদ্রে ছিদ্রে বাতাস আটকানো
যেভাবে নিজস্ব থাকে কোটরগুলিও, বড় গাছে
মহিমময়ীর মত বসে আছে সেই গাছ, নিজস্ব প্রাচীন
উদার আকাশ থেকে নিয়েছে বিষের কণা, বিলিয়েছে দাহিকাজ্বালানি।
সময়ের সমুদ্রের কাছে এসে নিজস্ব আলোকবৃত্ত ফুলে উঠছে . . .
ফেটে যাচ্ছে, মুহূর্তের . . . এইভাবে জীবনকে দেখি।

## ভাল ও খারাপ

চারিদিকে ভালময়। হে ঈশ্বর, তুমি ভালময়।
ভাল ও করুণ সবকিছু।
আমাদের অস্তিত্ব কাজলের কালিলিপ্ত, ঘৃতের কুন্ডলীবদ্ধ ধোঁয়া।
খারাপ অধীর পুষ্প, ফুটে উঠতে চায় বরাবর
ভাল চায় কেবলি অলীক
স্বপ্নঘ্রাণ চুষে খেতে, জলে জলে ছড়াতে পরাগ
মৃদু সব কাজ পারে ভাল।
যা কিছু ঘটনাবান, যা কিছু প্রত্যক্ষ, উঁচু হয়ে ওঠা, শরীরী, বালক
তাই তবে মন্দ, আর ভাল সেই ক্রিয়াময়তার উল্টোদিক।
ভাল সেই বালিকা, যে কুয়াশার মতন বেছানো দিঘিময়
ভাল সেই পালিকা, যে সকালের আলো দিয়ে প্রতিজাগরণ তৈরি করে
তারপর সেই আলো ছিঁড়েখুঁড়ে ধোঁয়া উঠে যায়
উনুনের। প্রথম দুধের জ্বাল, প্রথম চায়ের ভাঁড়, প্রথম রুটির ফুলে ওঠা।

---

**যশোধরা রায়চৌধুরী** — বাংলা ভাষার উল্লেখযোগ্য কবি এবং গল্পকার। তার লেখা তেরোটি কাব্য আর ছয়টি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। লেখার জন্য ১৯৯৮ সালে কৃত্তিবাস পুরস্কার ও বাংলা অ্যাকাডেমীর অনিতা সুনীলকুমার পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তার গল্প ও কবিতার বইয়ের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য — পণ্যসংহিতা, পিশাচিনি কাব্য চিরন্তন গল্পমালা, মাতৃভূমি বাম্পার, ভবদেহে স্বর্গীয় সঙ্গীত ইত্যাদি। যশোধরা ফরাসী থেকে বাংলাতেও অনুবাদ করেছেন।

# উপাসনা সরকার

## উষ্ণতা - ১

ভালোবাসার জাত বাছবিচার নেই,
মাংসের হাড়, মাছের কাঁটা ল্যাজা মুড়ো
ধড় খেয়ে বসে আছে হতভাগা বেড়ালের মতো,

ভালোবাসা ঝুঁকে পড়েছে জলে
হলুদ অমলতাস আরো হলুদ হয়ে
উঠেছে অপেক্ষায় . . .

যেভাবে বিখ্যাত হয়ে গ্যাছে
আয়নার ধুলো আর যথারীতি সাফ সাফাই
সেরে ক্লান্ত হৃদয়ের দিকে তাকানোর
অবকাশ নেই এক ফোঁটা....

ঘড়িতে পেরিয়ে যাচ্ছে মাস, বছর...
উষ্ণতার সংজ্ঞা বোঝেনা আবহাওয়া দপ্তর,
ফের মিথ্যে হয়ে গেছে পূর্বাভাস!

## উষ্ণতা - ২

"আসলে সকলে একা,
একসাথে থাকার ভান করে।"

একথা শুনেছিলাম জনপ্রিয় এক নায়কের মুখে।
যিনি বসিয়েছিলেন,তাঁকে তো পর্দায় দেখা যায় না,
বারণ আছে।

তারপর থেকে আমার মনে হয় বড় সত্যি,বড় সত্যি।

তিনি একা। সমুদ্রের ধারে পায়চারি করেন।
সাদা পাজামা, ঠোঁটে চুরুটের বিলাসী সোহাগ . . .

যে নেতার হলুদ চশমা,তিনিও একা।
যিনি আজ আছেন,কাল নেই।
কাল যিনি থাকবেন, পরশু তার কেউ থাকবে না . . .

বাকিটা ভান . . .

তারপর একরাশ মাছি ভনভন,

গিলে খাওয়া উষ্ণতা।

সকলেই একা,
বাকিটা উষ্ণ অভিনয়!

---

**উপাসনা নন্দী (সরকার)** – জন্ম '৭৯-এ খড়দায়, উত্তর চব্বিশ পরগণায়। গানের ভিতর দিয়েই কেটেছে কিশোরীবেলা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণি প্রথম। বর্তমানে ভূগোলের শিক্ষিকা। আলমারীর কোণা ঢাকা পড়েছিল কবিতালেখার আকাশ। যে যাই বলুক না কেন ইচ্ছেয়-অনিচ্ছেয় নানা কৌতূহলী লেখা নিয়ে ফেসবুকে সদাহাস্য মুখ। ধূমকেতুর মত বাংলা কবিতায় ঢুকে পড়েছেন তার নতুন কবিতার বই নিয়ে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, গান, সাজগোজ, একলা মায়ের সংসার, রান্না খাওয়ার উৎসাহ এই নিয়েই শব্দ যাপন। এখন ভরসা কবিতার অন্তরমহলে।

## রবিরশ্মি ঘোষ

### হারিয়ে যাওয়া আমি

আমার ছিল সিঁড়ি বেয়ে ওঠা
তোমার শুধুই মাটির সাথে কথা,
সেদিন হঠাৎ আবার হল দেখা
পথ মিশে যায় পথের সাথে যেথা।

আমার যেত কাজে কাজে বেলা
তোমার শুধু অকাজেরই খেলা,
বৃষ্টি ভেজা দিনের শেষে রোদ
আকাশ জুড়ে সাতটি রঙের মেলা।

আমি ভাবতাম গুরুগম্ভীর কথা
তোমার মাথায় শুধুই রূপকথা,
মেঘের ওপর মেঘের রাজপ্রাসাদ
ধানের ক্ষেত যেন নকশী কাঁথা।

সারা জীবন অনেক যোগ বিয়োগ
অনেক ধাঁধা অনেক গোলযোগ,
তুমি আমার হারিয়ে যাওয়া মুখ
তোমার সাথে ছিল না যোগাযোগ।

সাঙ্গ হলে রঙের মেলা
চলবে তোমার আমার খেলা,
সেদিন তোমায় আমায় মিলে
ভাসিয়ে দেব গানের ভেলা।

---

সিডনি তে কর্মরত **রবিরশ্মি ঘোষ** এর লেখার জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ ইংরেজি তে লেখা উপন্যাস "দ্য গডস অফ সুমেরু" দিয়ে। তারপর শুরু হয় বাংলায় কবিতা, গান, ছোটগল্প ও নাটক লেখা। লেখার বিষয় হিসাবে বিশেষ ভাবে পছন্দ ঐতিহাসিক এবং পৌরানিক পটভূমিকায় মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক । কবিতা লেখায় বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ নিয়ে পরীক্ষা চালাতে আগ্রহী এবং কবিতার মাধ্যমে গল্প বলতে তার বিশেষ পছন্দ অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

## ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

# হে ক্ষণিকের অতিথি

সব ক্ষণিকের অতিথি আসে আর চলে যায়
ফুল ফল গাছের পাতার মত গ্রামের বৃদ্ধরা
নদী নেচে ওঠে ভেঙে পড়ে কোথায় হারায়
মাটির থালা পিতল কাঁসার মত সবই অধরা।

আসে উঠতি মেয়ের ঝাঁক নব যৌবন মেলে
ক্রমে কমে আসে ইলিশের মৌসুমের মত
বসন্তে রঙ মেখে ঝরে যায় পাতাদের দলে
ভিনদেশী পাখীরাও আসে যায় অস্থায়ী যত।

অস্থায়ী ভাড়া বাড়ী ভিটে ঘর মাটির দেয়াল
বহুবর্ষজীবী বৃক্ষ উপড়ে যায় ভূকম্পে তুফানে
পলেস্তারা খসে যায় চিড় খায় বিশ্বাস বিশাল
নগর সভ্যতা গ্রাস করে সুনামির টানে।

সবই ছিল, বাবুইয়ের বাসা, শিল্প, লতাপাতা,
দুমড়ে মুচড়ে ভেসে যায় গঙ্গার জলের কামড়ে
বন্যায় ভাসে ঘর, ঘড়া-কলসি, সবুজের ছাতা
হারায় ফসলের ঘ্রাণ দীর্ঘশ্বাসে সবুজ চিৎকারে।

শুধু যাওয়া আসা দলে-দলে রঙিন কাননে
লাল নীল সবুজ হারায় গেরুয়া মননে।

---

**Indrajit Sengupta** – Working in Larsen & Toubro as a Sr. Manager (EHS- Environment, Health & Safety). Already published 2nos. of Kabya Grantha "Nepathyacharini" & "Ogo Bideshini". "Nepathyacharini" consist of so many poems with the relationship of Togore, Like Anna Tarkhar, Kadambari Devi, Luci, Victoria, Indira, Tomi, Ranu, Hemantabala, Maitreyi etc. "Ogo Bideshini" Consist of so many poems with the relationship of Tagore like Olga Lorenza, Clara Butt, Butension, Harriet Monro, Helen Kellar, Nivedita, Harriet Moody, Miss Jen, Sinclair, etc.

## মমতা দাস (ভট্টাচার্য)

### মৃত্যু চিহ্ন

মৃত্যু জানে আমাদের সংক্ষিপ্ত আশ্রয়
ঐশ্বর্য, বিষয়-আশয় মুহূর্তে বিলীন
আমি তো সুখফল মুখে নিয়ে বাঁচি
তবুও মৃত্যু তার খোলস বিছায়
দিনদিন প্রগাঢ় আলিঙ্গন
সম্পর্ক প্রয়োজনহীন হয়, বন্ধুত্ব নিষ্ফল
আমিতো চেখেছি বিষফল
বিস্মিত চেতনায় অবিস্মৃত সত্য মনেরাখা
জীবন যেমন-ই হোক সব চিহ্নে মৃত্যুই আঁকা !

**মমতা দাস (ভট্টাচার্য)** – স্বাধীনতার কিছু পরে ওপার বাংলার (তখন পাকিস্তান) সিলেট জেলায় জন্ম। তিন বছর বয়সে শিকড় উপড়ে এপার বাংলায়। জীবনের প্রয়োজনে দেশের নানাপ্রান্তে, বিদেশেও প্রবাসী জীবন। দীর্ঘপ্রবাসের পর কলকাতায় ফেরা। যৌবনের ছেড়ে যাওয়া শহরটা বদলে গেছে। মন খারাপ। তবু লিখে যাওয়া। তিনটি গদ্য গ্রন্থ প্রকাশের পর দুটি কাব্য গ্রন্থ। ইতিমধ্যে মুম্বাই, ডুয়ার্স এবং কলকাতার বিভিন্ন কাব্য সংকলনে অন্য কবিদের পাশে স্থান পাওয়া। বাংলাদেশ থেকেও সংকলনে কবিতার স্থান লাভ। সতত নিরত সাহিত্য চর্চায়। পেশা নয়, নেশা।

## সৌমিত্র চক্রবর্তী

### এখন যেরকম

আজকাল
জমি ভাগ হলে
আলের ওপর দাঁড়িয়ে ভালোবেসে আসি।

হাওয়ার নাম ঝড় হলে
দরজা খুলে দিই
বলি
তান্ডব তো রইলই
আগে পাখার নিচে বসো।

ছুরিকে বলি
পিঠের দিকে কেন?
শেষ মুহূর্তেও
দেখতে চাই যে তোমায় !

এখন এরকমই।

কত মানুষ
ভালোবাসবার আগে
হেঁটে চলে গেল
কত মানুষকে ভালোবাসা
বাকি রয়ে গেল
ভাবতেই ফুরোচ্ছে
জীবন, দিন, সময়
শুধু ভালোবাসা না।

**সৌমিত্র চক্রবর্তী** – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে।

## সঞ্জয় চক্রবর্তী

### তিস্তার মতো মেয়ে

পাহাড় পেরোতো
মেঘ জাল ছিঁড়ে, খরস্রোতা পথ বেয়ে,
বাজার, বাড়ী, অফিস কাছারি, তিস্তার মত মেয়ে।

জল ছুঁয়ে যেতে
যখন আঙ্গুল ডোবাতে তিস্তার পাড়ে আসি,
দেখি, শহরতলীয় তরাই ভেঙ্গেছে উচ্ছল জলরাশি,

আলুথালু অভিমানী,
"ঘড়ি দেখনি ? আসবো বলে যে এতো দেরি করে এলে,
কতটুকু আর সময় থাকলো অফিসের কাজ ফেলে ?"

জল বেয়ে চলে,
চুপ কথা চলে নিস্তব্ধতা বেয়ে,
পাশে থাকে কেউ, ছোট ছোট ঢেউ, নদীমাতৃক মেয়ে,

জল ছিটে লাগে মুখে,
চোরা ঘুর্ণির বুকে, শাড়ী শাল সবুজ জড়িয়ে নিয়ে
বলেছিলো "সব মেয়ে নদী নয়, সব নদী নয় মেয়ে"

শুকিয়েছে স্রোত,
রুক্ষ পাহাড়, শহরতলীও একা,
তবু মনে পড়ে তিস্তার পাড়ে তিস্তার সাথে দেখা,

জানিস তিস্তা
প্রেম কিসে হয় আজো ঠিক করে বোঝা যায় না,
সে তো চোরা ঘুর্ণির অতলে ডোবায় তল খুঁজে ঠিক পাই না ॥

### বেকার কবিতা

ভাবলে ছাতার মাথা, দূর, ভাল্লাগেনা বটে,
বেকার ছেলের কাব্যে কি আর রসালো প্রেম ঘটে ?
আড় চোখ মেরেছে ঝাড়ি,
বিকেল মোড়ে অফিস ফেরত হাওয়ায় ওড়া শাড়ী ।
"গুরু ঝাঁঝেই মরে যাবি",
দু চারটে প্যাঁক গিলতে পারে পাজামা পাঞ্জাবী ।
তবে কান পাতিনি ওসবে,
থোড়াই আমি ডরাই পাতি ভিখারী মানবে ।
তখন হালকা টিপের রেখায়,
আলতো আঁচল লাজুক বুকের গভীর উপত্যকায়,
সেথায় হারাই বারে বারে ।
গন্ধ ছড়ায় আঁধার কালো হেড এ্যন্ড শোল্ডারে ।
কিন্তু চোখ ফেরাতেই ছবি ।
ছলকে ওঠা চায়ের কাপে ঘোড়ার ডিমের কবি ।
শেষে সামনে দিয়ে গেলে
পাশ কাটিয়ে, থমকে গেল "অসভ্য এক ছেলে"।
সেই আঁচেই গরম লোহা ।
হলুদ শাড়ী হেব্বি লাগে চর্যাপদের দোঁহা ।
সে দোঁহায় দোঁহে লোকে,
কিছু নিন্দে মন্দ কইতে পারে যযাতি নিন্দুকে ।
সে সব সহ্য হবে সবই,
তোমায় নিয়ে অকুল পাথার পাড়ার বেকার কবি ।

---

**সঞ্জয় চক্রবর্তী** অধুনা সিডনী নিবাসী । পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক । ছন্দ তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে । ফেসবুকিয় জগতে অনেক দিন ধরে টুকিটাকি লেখার পর অবশেষে বাতায়নে আত্মপ্রকাশ । সঞ্জয়ের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল মেঘ আর বৃষ্টি ।

# দেব বন্দ্যোপাধ্যায়

## প্রবাহ

বড্ডো গুমোট কদিন
ফ্যানের হাওয়া গায়ে লাগছে না
বস্তাবোঝাই ট্রাক, মিনিবাসের যাত্রী
সবাই দাঁড়িয়ে ।
নদীর হা-কঙ্কাল সার
শেষ বিকেলে পাঁজরে বাতাস লাগালে
চিক চিক করে ওঠে বালি
ঠিকরে বেরিয়ে আসে
ছেঁড়া জুতো, প্লাষ্টিক ব্যাগের জরা ।
হয়তো চাঁদের উত্তর গোলার্ধে
বইছে টলটলে সকাল,
হয়তো কেউ ভাঙছে তালা,
সাদা চুনকামের নিচে
আবছা হয়ে আসছে দেয়াললিখন,
সেই গতবারের দেবীপক্ষে বন্ধ হয়েছিল
আমাদের চটকল,
তবু আজও কেমন যেন সচল
আগাছায় সরে সরে যায় সরীসৃপের প্রবাহ . .

তনিমার পেন্সিল স্কেচ 'প্রবাহ'। তার অনুপ্রেরণায় কবিতার রং ঢাললেন দেব ।

---

**দেব বন্দ্যোপাধ্যায়** – পেশায় পদার্থবিদ্যার গবেষক, তবে যতটুকু সময়ের ফাঁকফোকর তাতে শুধু কবিতা নিয়ে ভাবনা চিন্তা আর সাহিত্যের ছাত্র হবার বাসনা । দেবের লেখা কিছু পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । দেব সপরিবারে মিশিগানের বাসিন্দা ।

# মানস ঘোষ

## অরূপকথা

মানছি তোমার সঙ্গে ছিল, আধখানা চাঁদ, উতল হাওয়া,
তাতেও কি আর রূপকথা হয়, সঙ্গোপনে বলতে চাওয়া ?
বিষম বারণ সময় ছিল, স্পর্শকাতর কার্যকারণ।
দৃষ্টি বদল সুগম পথে, মিলেছিল মনেতে মন।
অল্প কথাও কম কথা নয়, হাস্নুহানার অপেক্ষাতে
আকাশ নেমে এসেছিল,তারায় ভরা খোলা ছাতে।
আলতোছোঁয়ার আতসবাজি,আলসেবিহীন তেপান্তরে,
উড়ল আঁচল সিফন শাড়ির, সামলে নিও পরের বারে।
ভুলেও যেন ভুল না করি, বলেছিলে আপনমনে।
মনে রাখার কারসাজি এ, সাজা'ই বুঝি রোমন্থনে।
ফেলে আসা হলুদ ঘাস আর.. নদীর স্রোতও পাথরচাপা।
সোনারকাঠির হদিস ছাড়াই ফাগুনবেলার অরূপকথা।

হয়তো আজও, আধখানা চাঁদ চিলেকোঠার শিষমহলে,
ছড়ায় আলো বেহিসাবি, কী পেলে আর কী খোয়ালে।

---

**মানস ঘোষ** – মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ''ট্রেনচালক'' । এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার একটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে । জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা 'বাতায়ন' পাশে, আমাদের মাঝে ।

# স্নেহাশিস ভট্টাচার্য

## ঘষা কাঁচ

ঘুম ভাঙা চোখ,
ধুয়ে ফেলা আড়মোড়া,
ধোঁয়াওঠা ব্যস্ত সকাল ।
এদিকে আলসেমি এসে ভর করে
জানলার কার্ণিশে,
একটা শালিখ ঘাড় ফুলিয়ে তাকিয়ে,
চোখ পড়তেই একটু যেন আনমনা,
ভাবে আচ্ছা নির্লজ্জ তো !
হেসে ফেলে অন্যদিকে তাকাই,
দেখি পেয়ারা গাছে লম্বা লেজের চন্দনা,
গলায় লাল দাগ।

আবার আলসেমি এসে গাছে বাসা বাঁধতে চায়।
দূর থেকে হঠাৎই বিস্মৃত সাইরেনের আওয়াজ, গরম ভাতের গন্ধ,
কাজের সাড়া ।
আলসেমি জানলার কাছে এসে বসে . . .
ঘষা কাঁচ, আমি দেখতে পাই . . .
ও পায় না।

---

**স্নেহাশিস ভট্টাচার্য** – কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য সম্প্রচার দপ্তরের কর্মী। বর্তমানে কলকাতা দূরদর্শন ভবনে কর্মরত। বহুদিন থেকেই চলে আসছে সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠ এবং নিভৃত চর্চা। পেশাগত ও পারিবারিক ব্যস্ততায় যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল তাঁর এই সৃষ্টিশীলতার ধারা, সে সময় এক বুধ সকালে আকাশবাণী মৈত্রীতে তাঁর নিজের লেখা পড়তে শোনা (এবং তারপর থেকে প্রায় নিয়মিত সেরার বাছাই এর তালিকায়), তাঁর সাহিত্যচর্চায় নতুন উৎসাহের সঞ্চার করে। সেই থেকেই চলে আসছে জীবনের জলরঙে স্বপ্ন বোনার কাজ, কখনো ছন্দে, কখনো বা গদ্যে . . .

# রুবাইয়া জেসমিন (জুঁই)

## উদ্বাস্তু

একটা শান্ত নিরিবিলি দিনে কাউকে না জানিয়েই হঠাৎ সীমান্ত পার হয়ে যাব। যাবতীয় নাড়িরটান ছিঁড়ে।

যেমন ঝড় এলে পাখিরাও উদ্বাস্তু হয়ে যায়।

শুধু দেওয়ালে লেগে থাকা লাল দাগ মৃতের মতো চিত হয়ে শুয়ে থাকবে। কথা নেই।

যাদের ঘরে বোবা চাঁদের গল্প।

চায়ের কাপে থোকায় থোকায় ফুটবে গন্ধরাজ।

পাথুরে জমিতে শায়িত ফালাফালা কবর। তবুও ভোরের আগে ডেকে ওঠে একটি অভ্যাসী মোরগ।

সদ্য স্নান সেরে আরামে শুকোচ্ছে বাবার কাশ্মীরি চাদর। হাঁটু ভাঁজ করে বসে আছে স্বজনের শোকে একখণ্ড ঝিলাম নদী।

মায়ের গভীর অরণ্যের মতো সবুজ দ্বীপের শাড়ি।

সেসব তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। কখন বদলে যাবে হাওয়ার গতি।

---

**রুবাইয়া জেসমিন (জুঁই) সাংবাদিক** – জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির একটি প্রত্যন্ত গ্রাম সাপ্টাবাড়িতে জন্ম। বাংলা সাহিত্যে মাস্টার ডিগ্রি করে এখন অস্থায়ীভাবে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত আমি। তার সাথে লেখালেখি। দৈনিক কাগজ আজকাল, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, উত্তরের সারাদিনে লেখা প্রকাশিত হয় নিয়মিতভাবে, আসাম হিলস টাইম ইংরেজি সংবাদপত্রে একটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ হয়। এছাড়া ''তিস্তা কন্যা পত্রিকা''র সম্পাদনা।

## জয়তী রায়

# পৌরাণিক গল্প – কৈকেয়ী কথন (তথ্যঃ মূল রামায়ণ)

হে জানকী,

চোদ্দ বছর বনবাসের আজ দশম দিন।

তোমার মহলে পড়ে আছে ছেড়ে যাওয়া বহুমূল্য অলঙ্কার, বস্ত্র, মহার্ঘ মৈরেয়! সব ফেলে রেখে স্বামীর হাত ধরে সোজা চলে গেলে। ফিরেও তাকালে না। ত্যক্ত রাজপ্রাসাদ, লোক জন, সুখ ঐশ্বর্য।

গবাক্ষ দিয়ে সংগোপনে দেখছিলাম তোমাকে! নারীর এমন রূপ ? এমন স্বাধীন রূপ? সিদ্ধান্ত নেবার এমন ক্ষমতা – দেখিনি আগে। লোক আমাকে রূপসী বলে, আমার রূপে অন্ধ রাজা দশরথ – অন্য রানীদের দিকে তাকান না পযর্ন্ত – এমন গুঞ্জন সর্বত্র।

কিন্তু তোমার রূপ ? আহা! সে যেন স্বর্গের পারিজাত! ভোরের প্রথম শিশির! নদীর জলে ভেঙ্গে পড়া জোৎস্না!

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঠিক সহাবস্থান হলেই তাকে রূপসী বলা যায় না। তোমার রূপে ছিল ব্যক্তিত্বের বিভা। নিজের প্রতি শ্রদ্ধা। পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ নিজেকে দেখতে ভীত থাকে বেশি।

বিপরীতে আমার রূপ ? সর্বনাশের কোনো রূপ হয় ? হতাশার হয় কোনো অবয়ব ? আমার কোনো রূপ নেই। কৈকেয়ী শুধু এক অবস্থার নাম। যে অবস্থা ধ্বংস করে দিল তোমার সাজান সংসার। হাসি মুখে বিদায় নিলে তোমরা তিনজন।

চিৎকার করে কাঁদছিল সারা অযোধ্যা। রাজা দশরথ দৌড়ে দৌড়ে এলেন প্রধান ফটক পর্যন্ত। চোখের জল আর মুখের লালায় ভিজে গেছে তাঁর সর্বাঙ্গ। "হা রাম! হা রাম!" বলতে বলতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন বার বার।

রানী কৌশল্যা মৃতপ্রায়। তিনদিন ধরে জলটুকু পান করেন নি। তাঁকে প্রাণপণে সেবা করে যাচ্ছে রানী সুমিত্রা।

লুকিয়ে বসে ছিলাম – কারণ শোকের আগুনে পুড়ছিল একটি নাম। সে আমার নাম। হে সীতা!

তখন অযোধ্যার মানুষ জন, যারা প্রজা মাত্র – তারা অভিশাপ দিচ্ছে আমার নামে। মৃত্যু কামনা করছে। ঘরে ঢুকে পড়েছে ভীত মন্থরা। যদিও তাঁর মুখ ছিল উল্লাসে চকচক। এতদিনের আশা পূর্ণ। রাম সীতা লক্ষণ যাচ্ছে বনবাসে। ভরত হবে যুবরাজ। মন্থরার দিকে তাকিয়ে ঘৃণা উঠে আসছিল ভিতর থেকে। প্রাণপণে চোখ সরিয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে পড়ে রইলাম শয্যায়।

তোমরা বনবাস যাবার ঠিক পাঁচ দিন পরে রাজা দশরথ মারা গেলেন! বাঁচার কোনো ইচ্ছেই ছিল না তাঁর। যে রাজা, আমাকে চোখের আড়াল করতেন না এক মুহূর্ত, রাজ কার্যে অবহেলা করে শয়ন বসন আহার – সমস্ত কিছু তাঁর ছিল আমার হাতে, শেষ পাঁচ দিন সেই প্রিয়তমা পত্নীর ছায়াটুকু হয়ে উঠল বিষ। উন্মাদের মত আছড়ে পড়লেন কৌশল্যার পায়ে। তাপিত প্রাণ আশ্রয় চাইছিল আর এক তাপিত প্রাণের কাছে! হায় দুর্ভাগা রাজা! অভিমানী কৌশল্যা মুখ ফিরিয়ে নিল। ফিরিয়ে দিল সুমিত্রা। দূর থেকে দেখলাম তিনি গোল গোল ঘুরতে ঘুরতে উদ্যানের গাছ তলায় চুপ করে বসে প্রাসাদের দরজার দিকে চেয়ে রইলেন। যেখান থেকে চলে গেছে তাঁর প্রিয় রাম। বুক ফেটে এলেও কাছে যাবার সাহস হল না। ওই ভাবে পড়ে থাকতে থাকতে পাঁচ দিনের দিন গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হল। কেউ ছিল না কাছে। সম্পূর্ণ একলা। জানালায়

বসে তাকিয়ে থাকতাম আমি। শত দুঃখেও ঘুম যেন মায়ের মত কাছে আসে। হাতের উপর মাথা রেখে কখন যেন তন্দ্রা এসেছে বুঝতেও পারিনি। হঠাৎ কি মনে হতে চমকে তাকিয়ে দেখি মাথা ঢলে পড়ছে এক পাশে। ছুটে যাব, মন্থরা বারণ করল

– "শান্তিতে যেতে দাও রানী। উনি এখন মুখ দেখতে চান না তোমার !

একলা। সম্পূর্ণ একলা অসহায় ভাবে মারা গেলেন অযোধ্যার প্রতাপশালী রাজা দশরথ। মৃত্যুর পরেও চোখ দুটি ছিল তাকিয়ে ছিল প্রাসাদের মূল পথের দিকে। মৃত্যুর পরেও চোখে ছিল জল। ছিল আশা। যদি ফেরে রাম। যদি আবার এসে গলা জড়িয়ে ধরে।

প্রাসাদ জুড়ে আবার উঠেছে ধিক্কার ধ্বনি। পুত্র ভরত আমাকে ছেড়ে চলে গেছে মামার বাড়ি। ওখানে বসে রাজ্য শাসন করবে সে। অপেক্ষা করবে শ্রীরামের জন্য।

আমার বিলাস বহুল মহল এখন আর নেই। উদ্যানের পাশে ছোট এক ঘরে স্থান এখন আমার আর মন্থরার।

অভিশাপ কখনো কখনো জীবন্ত মানুষের রূপ ধরে সামনে আসে। মন্থরা হল মানুষ রূপী অভিশাপ। কোনো ছেলেবেলা থেকে এই অভিশাপের সঙ্গে আছি আমি! কালো কালো জ্বালাময় ঈর্ষা আর অধিকার বোধ যেন সরু সরু পোকার মত আমার শরীর জুড়ে ছড়িয়ে দিত মন্থরা। ছোট্ট আমি, পালাতে চাইতাম। সুস্থ জীবন চাইতাম। হারিয়ে যাওয়া মা কে ডাকতাম – খল খল হেসে অভিশাপ চেপে ধরত আমায়। ভয়। ভয়। ভয় – ভয়ের চাপে থাকতে থাকতে হয়ে উঠলাম দুর্বিনীত, জেদী, রাগী, অভিমানী।

সীতা, চোদ্দ বছর অপেক্ষা করব আমি। তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে আমার। প্রতিদিন প্রতিরাত একলা একলা নিজেকে নিজে শেষ করেও বেঁচে থাকব – শুধু প্রকৃত বিচারের আশায়। কেন জানি না, মনে হয়, পৃথিবী ভুল বুঝলেও, তুমি বুঝবে আমাকে – বিশ্বাস করবে আমি ভালোবাসার জন্য এসেছিলাম অযোধ্যায়। ভালোবাসার আকণ্ঠ পিপাসা মিটেছিল অযোধ্যায়। তাকে নষ্ট করে জীবনকে আবার বানিয়ে ফেলব মরুভূমি? এমন অদ্ভুত বোধ চেতনায় আসার আগেই যেন মৃত্যু হয় আমার!

দুই।।

সারা পৃথিবীর কাছে আমি ঘাতক। নৃশংস রমণী।

যার মুখ দেখলে পাপ হয়। হে সীতা। আজ প্রশ্ন করি দোষ সত্যি আমার ? জেদী, অহঙ্কারী, অভিমানী, অধিকারবোধ – এই চরিত্র গড়ে ওঠার পিছনে দায়ী নয় আমার বিপন্ন শৈশব ? কে না জানে বহু অপরাধী চরিত্রের ভিত প্রোথিত থাকে, তার অবহেলিত শৈশবের মধ্যে দিয়ে! সীতা! তুমি কোনদিন জানো কাকে বলে একাকীত্ব? ছোট বালিকা হঠাৎ সকালে উঠে যদি জানতে পারে তার মা চলে গেছে। বিতাড়িত করেছে তার পিতা – সে কি করবে তখন ? অথচ ঘটনা ছিল অতি সামান্য। বৈকালিক উদ্যান ভ্রমণ ছিল আমার পিতা মাতার প্রিয় মুহূর্ত। তেমনি এক পরম প্রেমময় ক্ষণে পিতা আপনমনে হাসছিলেন, সরোবরে কেলি করা দুই রাজহাঁস দেখে। মাতা কৌতুহলী। বার বার জানতে চাইলেন স্বামীর হাসির কারণ। পিতা বললেন :

"বলব না রানী। আমি পাখির ভাষা বুঝি। কিন্তু কি বুঝি সে কথা বললে আমার মৃত্যু অনিবার্য। এমন কৌতূহল দেখিও না, যাতে তোমার স্বামীর মৃত্যু হতে পারে!"

মা তবু জিদ করলেন। বাবার কথায় গুরুত্ব দিলেন না। জিদ করলেন। করতেই থাকলেন। বাবার রাগ বাড়তে থাকল।

বাড়তেই থাকল। দুজনের মাঝে বইতে লাগল ক্রোধের নদী। অভিমানী দাম্ভিক রূপসী মা চলে গেলেন প্রাসাদ ছেড়ে। বাবা ক্রোধে মায়ের নাম উচ্চারণ বন্ধ করে দিলেন। অসহায় আমি দৌড়ে গেলাম বাবার কাছে। তিনি বললেন – চুপ করো।

তিনি বললেন :

"এত দাস দাসী। এত ঐশ্বর্য। এত প্রতিপত্তি। ভোগ করো। সব তোমার। ভুলে যাও ঐ দুর্বিনীত মায়ের কথা। স্বামীর প্রাণের চাইতে বড় হল কৌতূহল? এমন নারী ঘৃণার যোগ্য।"

দুটো সময় মানুষকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে নেই। যখন সে আবেগ তাড়িত। যখন সে ক্রোধে অন্ধ। তবে পরিণতি হতে পারে ভয়ঙ্কর। পিতামাতার হঠকারী সিদ্ধান্ত জীবনের ভিত করে করে তোলে দুর্বল। আমিও কেমন হকচকিয়ে গেলাম।

অসহায় ভীরু চোখ দুটি মেলে দিলাম নিষ্ঠুর পৃথিবীর দিকে। কি করে বোঝাই – মায়ের বিকল্প দাসী হয় না কখনো। অর্থ প্রতিপত্তি দিয়ে মাতৃত্ব কেনা যায় না।

পত্র পাঠালাম মায়ের কাছে এই ভেবে তিনি বুঝবেন। অভিমান ফেলে চলে আসবেন। অন্যায় তাঁরা করেছেন। আমার দোষ কোথায়? আমি কেন কষ্ট পাব? পত্রের উত্তর এলো না। মনে আছে, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ছিলাম পত্রের উত্তরের আশায়।

যুধাজিত, আমার বড় ভাই – সে ব্যঙ্গ করে বলল –

"প্রবৃত্তি চালনা করে মানুষকে। প্রবৃত্তি জয় করে তোমার কাছে ফিরবে না পিতা মাতা। এ সত্য যত তাড়াতাড়ি বুঝবে তত মঙ্গল।"

নরম পেলব সুন্দর সুগন্ধী মাতৃ কোলের পরিবর্তে ঠাঁই পেলাম কর্কশ খসখস নিষ্ঠুর শূদ্র দাসী মন্থরার কোলে। আমি তাঁকে ভয় পেতাম। তার ভালোবাসাকে ঘৃণা করতাম। একলা থেকে একলা জীবন বহন করার কষ্ট তুমি কোনদিন জানবে না সীতা। বাইরে চাকচিক্য ভিতর ঘুন ধরা আমার শরীর বড় হতে লাগল আপন নিয়ম মেনে। মন রয়ে গেল কাঁচা। অপরিণত।

তিন।।

স্বয়ম্বর সভায় পুরুষদের চোখ দেখেছ কোনদিন? মাকড়সার জালের মত আঠাল। পিচ্ছিল। চ্যাট চ্যাট।

বিবাহে মত ছিল না আমার। কিন্তু পিতার আদেশ অমান্য করার সাহস নেই। কেকয় রাজ অশ্বপতি, যা বলবেন সেটাই শেষ কথা। ক্রোধ অহঙ্কারের সে পাঁচিল ডিঙিয়ে যাবার ক্ষমতা কারোর ছিল না।

ছেড়ে চলে গেলেও মায়ের রূপ আমার শরীর জুড়ে বেড়ে উঠছিল নতুন করে। দেশ বিদেশ থেকে বহু যুবক রাজা ছুটে এসেছিল বিবাহের আশায়। তার মধ্যে বেমানান বসে ছিলেন প্রৌঢ় রাজা দশরথ। অপলক দুটি চোখে দেখছিলেন আমাকে। চোখ দুটি জুড়ে ছিল মায়ার সরোবর।

আমি তাঁকেই বরণ করলাম। মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, শরীর দিয়ে বরণ করলাম তাঁকে। তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন ভালোবেসে। সে ভালোবাসা তরুণ প্রেমিকের না, পিতার মত কিছুটা। কুড়ি বছরের বড় তিনি আমার থেকে। প্রেম ছিল প্রশ্রয় মেশান। অনেক অনেক দিন পরে সেই ছোটবেলার মত ঠোঁট ফুলিয়ে আবদার শুরু করলাম। অনেক দিন পরে শুধু আমাকে ঘিরে শুরু হল জীবনের উৎসব। অনেক দিন পরে গর্বিত রাজহংসীর মত উচুঁ করলাম গ্রীবা। অনেক দিন পরে দর্পণে নিজেকে মুগ্ধ হয়ে দেখলাম।

আমি আকঁড়ে ধরলাম তাঁকে। এক মুহূর্তের জন্য ছাড়তে চাইতাম না। ভয় হত, ছাড়লেই বুঝি আবার আমি একলা হয়ে যাব। একাকীত্বের কুয়াশা ঘিরে ধরবে আমাকে। ভাবলেই দম বন্ধ হয়ে আসত।

রাজা দশরথ, তাঁর  কৈকেয়ী প্রেমের জন্য অযোধ্যার পরিবারে সৃষ্টি করছিল চাপা ক্রোধের। বুঝতাম এ অন্যায়। তবু শিশুর মত তাঁকে রেখে দিতাম ঘরে। পুত্র ভরত পর্যন্ত বিরক্ত হত। কিন্তু আমি নিরূপায়। মনের গভীর গোপন অন্ধকারে পিতা মাতা উপেক্ষিত শিশু কৈকেয়ী ভীষণ ভীত। শঙ্কিত। সে আর হারাতে চায়না। শরীরের ক্ষত লোক দেখে। মন দেখে কয়জন? তার উপরে মন্থরা! সে আমাকে ছাড়ল কই? বিয়ের পরে ছায়ার মত সেও এলো অযোধ্যা। যেটুকু শুভ ভাবনা ভিতরে বেঁচে ছিল, সে টুকু সরিয়ে দিতে থাকল সে। তাঁর লকলক লোভ এতটুকু ছাড়তে রাজি নয় আর কারো জন্য। সে কাউকে সহ্য করতে পারে না। রাম, লক্ষণ, কৌশল্যা সুমিত্রা কাউকে না। বড় বড় চোখ, ঝুঁকে পড়া শরীর নিয়ে প্রাসাদ চষে বেড়িয়ে তাঁর লোভী হাত চায় সমস্ত গ্রাস করতে।

ভালবাসতাম রাজকে। অসুরের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ক্ষত মুখের পুঁজ রক্ত নিজের মুখে টেনে টেনে সুস্থ করে তুললাম তাঁকে। দুই হাতের নিবিড় আলিঙ্গনে টেনে নিয়ে রাজা বললেন :

“বর চাও রানী। যা চাইবে তাই পাবে। দুটি বর তোলা রইল তোমার।

আমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়েছিলেন রাজা। শুষ্ক বিবর্ণ ঠোঁট দুটিতে আলতো চুম্বন দিলাম। বিকেলের আলো পড়েছে তাঁর মুখে। পরম আনন্দে এক হাত দিয়ে আমার কটি বেষ্টন করে বললেন রাজা,

যা চাইবে তাইই পাবে প্রিয়ে। বলো কি চাও ?

আবেগ থরথর গলায় বললাম:

আপনাকে সেবা করা ভাগ্যের কথা মহারাজ। প্রেমের কোনো বিনিময় হয় না।

আমার কথা শুনে মুদিত চক্ষু মহারাজের রোগ ক্লিষ্ট মুখে ফুটে উঠল তৃপ্তির হাসি। ঘরের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছিল স্বর্গীয় এক আভা।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ! হঠাৎ মন্থরা তীক্ষ্ম স্বরে বলে উঠল :

বর পেলে যখন, তাকে তুলে রেখে দাও কন্যা। পরে কখনো দরকার মত চেয়ে নেবে।

রামচন্দ্রের রাজ্যঅভিষেকের দুই দিন আগে, এক নির্জন দুপুরে মন্থরা এলো আমার ঘরে। সাপের মত কুব্জা শরীর ঘষে ঘষে। ফিস ফিস করে বলতে লাগল :

রাজা হবে ভরত। ভরত। ভরত। আর কেউ না। কেউ না। তুমি বর চাও। সেই দুটি বর। এক বর – ভরতের রাজ্য লাভ। অন্য বরে রামচন্দ্রের চোদ্দ বছর বনবাস। চোদ্দ বছর পরে প্রজা ভুলে যাবে রাম সীতা কে। বর চাও। বর চাও।

ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে বলতে লাগল এক কথা। আমার হাত থেকে খসে পড়ল রামের জন্য তৈরি নতুন পোশাক। খল খল হাসতে লাগল ঐ পিশাচিনী – রাজমাতা হবে তুমি। আর কেউ না। আর কেউ না।

মন্থরা বিষ দৃষ্টিতে দেখছিল আমাকে। ক্রমশ ঝুঁকে এলো আমার শরীরের উপর। কালো ছায়া দিয়ে ঢেকে দিতে থাকল শুভ বুদ্ধি। সাপের ফনার মত দুলতে থাকল ওই কুব্জা। ফিস ফিস গানের সুর ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল সারা ঘরে – রাজ মাতা কৈকেয়ী। রাজ মাতা কৈকেয়ী।

ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকল আমার চিন্তার ক্ষমতা। বিকারগ্রস্থ পশুর চিৎকার বেরিয়ে এলো গলা থেকে, ছুঁড়ে ফেললাম অলংকার, বস্ত্র। ক্ষতবিক্ষত করলাম নিজেকে। মাটিতে শুয়ে কাঁদতে লাগলাম হুহু করে। সাপের মত নিঃশব্দে সরে গেল মন্থরা।

রাজ্য জুড়ে খুশির উৎসব। রামচন্দ্রের রাজ্য অভিষেক। দান ধ্যান যাগ যজ্ঞে মুখরিত রাজসভা। হাসি আনন্দে ভরে আছে অন্দর মহল।

এমন সময় খবর গেল, রানী কৈকেয়ী অসুস্থ। দৌড়ে এলেন রাজা দশরথ। সময় স্তব্ধ হল। ইতিহাস বদলে গেল। শ্রীরামের রাজ অভিষেক বন্ধ হল। পরিবর্তে হল চোদ্দ বছর বনবাস !

ইতিহাস বদলাতে পারে নারী। যুগ সে কথাই বলে। আজ এত দুঃখের মাঝেও ভাবছি, আমি বদলে দিলাম সময়ের চাকা ? না কি মন্থরা ? না কি আমার মধ্যেই বাস করত মন্থরা ? প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বাস করে শুভ-অশুভ। সাদা-কালো। ভালো-মন্দ। বিকৃত শৈশব জন্ম দিয়েছিল মন্থরাকে আমার মধ্যে ? আমিই কি একাধারে মন্থরা আর কৈকেয়ী ?

চার ।।

হে জানকী,

অন্ধকার বিষাদ ভরা প্রাসাদের কোণে কোণে দুঃখী বাতাসের চলাফেরা, রাত চরা পাখির কর্কশ স্বর, কেউ নেই। কেউ কোথাও নেই। ভরত শত্রুঘ্ন আমাকে ফেলে চলে গেছে মামাবাড়ি। # যাবার আগে বিদায় নিতে এলোনা। আমি নিজে ছুটে গেলাম তাঁর কাছে। ব্যস্ত ছিল ভরত। অযোধ্যা প্রাসাদের দায়িত্ব এখন তাঁর। তবু সে চলে যাচ্ছে ! কেন ? প্রশ্ন করতেই কঠিন মুখে আপন সন্তান বলে ওঠে :

"আমার ইচ্ছে বা প্রবৃত্তি কোনোটাই নেই !"

– কারণ জানতে পারি ?

– আপনাকে বলতে বাধ্য নই আমি।

– ভরত ! অধিকারের সীমা ছড়িয়ে যাচ্ছ ! মনে রেখ, আমি তোমার জননী। সর্বোপরি এই রাজ্যের রানী।

– ভুল। ভুল। ভুল। কোনোটাই তুমি নও। জননী নামের অযোগ্য তুমি।

চিৎকার করে উঠল ভরত। এদিক ওদিক থেকে ছুটে এলো দাসদাসী। ঝরা পাতার মত নির্জনে পড়ে থাকা কৌশল্যা সুমিত্রা ছুটে এলো। আমি হতচকিত। লজ্জিত।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম :

শান্ত হও পুত্র। শান্ত হও। সংযত করো নিজ আচরণ।

উত্তরে তীক্ষ্ম বিদ্রূপ শাণিত গলায় বলে উঠল ভরত :

"তোমাকে সহ্য করতে পারছি না আমি !"

বলল এই কথা। আমার পুত্র। আহ। সুন্দর সুপুরুষ সুকুমার চেহারা। কবে বড় হল এত ? জন্মের পর থেকে মামাবাড়ি বেশি থাকে। ভালো করে দেখিনি অনেকদিন এই মুখ, এই বড়বড় দুটি চোখ। তৃষ্ণার্তের মত চেয়ে রইলাম। ভরত তীব্র ঘৃণা ঝরিয়ে বলে উাল:

"রাজার প্রিয়তমা পত্নী ! কৈকেয়ী ! দ্যাখো, তোমার প্রেমের আগুনে জ্বলে খাক অযোধ্যা। কোন রাজ্যের লোভে এমন করলে তুমি ! শূন্য সেই রাজসিংহাসন নিয়ে একলা থাকো এবার। রাজার কন্যা হলে না, হলে না রাজার রানী, না হলে রাজমাতা! পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃণিত নারী হিসেবে তুমি পরিচিত হবে!"

আকাশ থেকে আকাশে, সাগর থেকে সাগরে, নদী অরণ্য পাহাড় মথিত করে বেজে উঠল মাতার প্রতি পুত্রের অভিশাপ –

"চিরকালের জন্য ত্যাগ করলাম তোমাকে।"

বড্ড ভয় করে সীতা। একা লাগে। একা থাকতে পারি না আমি। চারিদিকে ছায়া ছায়া ঘোরে অভিশাপ। নির্জন রাজপুরী। থেকে থেকে বেজে ওঠে কৌশল্যা সুমিত্রার বিলাপ। অকাল বার্ধক্য ঝরে পড়ছে তুষারপাতের মত। সমস্ত শরীর জুড়ে অবসাদ। ক্লান্তি। ঘুম চাই। ঘুম। অঘোর এক ঘুম।

তোমাদের জন্য অপেক্ষায় প্রদীপ জ্বালাই রোজ। বনবাস থেকে ফিরবে যখন, সারা দেশ সেজে উঠবে আলোর মালায়। তার মধ্যে খুঁজে নিও এই অবহেলার প্রদীপটি। একবার তার সামনে দাঁড়িয়ে তোমার শান্ত চোখ দুটি তুলে যদি বলো

"বিশ্বাস করি তোমায়।" যদি বলো, তবে প্রাণ ভরে ঘুমোবো আবার।

অপেক্ষায় আছি সীতা। চোদ্দ বছর বনবাস আসলে কার ? চোদ্দ বছর নির্ঘুম রাত কাটল কার ?

তোমাদের না আমার ? উত্তর দিক ইতিহাস। আমি অপেক্ষা করি।

---

**জয়তী রায়** – বাড়ি কলকাতা। আদতে ভ্রামণিক। ঘুরে বেড়াই এক দেশ থেকে অন্য দেশ। কখনো থাইল্যান্ড, কখনো আমেরিকা, কখনো লন্ডন। মূলত কাজ করি, মানুষের মন নিয়ে। নেশা সাহিত্য। লিখি ছোটগল্প। পৌরাণিক চরিত্র। এবং মনোসত্ত্বিক বিষয় নির্ভর নিবন্ধ। উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত বই দ্রৌপদী, মুহূর্তকথা, ব্রহ্মকমল, সুপ্রভাত বন্ধুরা। ২০১৯-এ প্রকাশিত জনপ্রিয় বই ছয় নারী যুগান্তকারী। প্রকাশনা : পত্রভারতী ।

# রজত ভট্টাচার্য্য

## অভিজ্ঞান-মালতী

পর্ব এক

ইলিশ মাছের ডিম ভাজা আর তার সাথে মহুয়া থেকে তৈরি আসব অতি উৎকৃষ্ট সংযুক্তি। তারপর শুঁড়িখানার মালিকের ব্যবহারটিও সুন্দর। কৃষ্ণাপ্পা খেয়াল করেনি দিন শেষ, রাত্রি আসন্ন। শুঁড়িখানা ফাঁকা। মালিক ভূরিপাল মৃদু হেসে তাকে জানাল ব্যাপার আজকের মত শেষ। এবার উঠতে হবে। তবে একটি রৌপ্য মুদ্রা দিলে সে এখানেই তার শোয়ার বন্দোবস্ত করে দেবে। পানীয়ের দাম তার মধ্যেই ধরা আছে। কৃষ্ণাপ্পা উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বুঝলো একটু বেশি ফূর্তি হয়ে গেছে। ভূরিপাল অভিজ্ঞ লোক। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাত ধরলো। 'ওরে সনকা, তাড়াতাড়ি আয়। অতিথির সেবা কর।' কৃষ্ণাপ্পা হাতির দাঁতের তৈরি শিল্পকর্ম বিক্রী করে। সুদূর দক্ষিণাত্যে তার বাড়ি। এবার ব্যবসা ভালোই হয়েছে। সোনার মুদ্রা যা আমদানি হয়েছে তাতে কয়েক বছর আরামে যাবে। সে একবার কোমরে শক্ত করে বাঁধা রেশমের থলিটি অনুভব করে নিলো। সব ঠিক আছে। রিমঝিম শব্দ শুনে কৃষ্ণাপ্পা দেখলো একটি মেয়ে, প্রগাঢ় যৌবনা, তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। মেয়েটি এগিয়ে এসে তার হাত ধরলো। কৃষ্ণাপ্পা তার কোঁচর থেকে কিছু মুদ্রা বার করে তার মধ্যে থেকে একটি রৌপ্য মুদ্রা খুঁজে সন্তর্পণে ভূরিপাল এর হাতে দিলো। ভূরিপাল টাকা হাতে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে সযত্নে কোমরে গুঁজে রাখলো। তার ইঙ্গিত পেয়ে মেয়েটি কৃষ্ণাপ্পাকে ধরে বাইরের দিকে নিয়ে চললো। উঠোন ছাড়িয়ে একটি পায়েচলা পথ বাড়ির পিছন দিকে গেছে। সেখানে ছোট ছোট দুটি কুটির। কৃষ্ণাপ্পাকে নিয়ে সনকা তার একটির সামনে হাজীর হলো। কুটিরে আসবাব বলতে একটি খাট, তার ওপর শিমুল তুলোর তোষক। একটি কার্পাস চাদর ওপরে বিছানো। সনকা তাকে নিয়ে গিয়ে খাটের উপর বসালো। নিজেও পাশে বসলো। মুখে তার সলজ্জ হাসি। কৃষ্ণাপ্পা তার হাত নিজের হাতে তুলে নিলো। এই তো জীবন। এই জন্যই তো ভিন দেশে বাণিজ্যে আসা। সনকার দিকে আর একটু অগ্রসর হতে গিয়ে কৃষ্ণাপ্পা খেয়াল করেনি কুটিরের দরজা খুলে ভূরিপাল নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পর্ব দুই

আজ এই নিয়ে তিন দিন বল্লভ সকাল বেলা ঘাটে এসে বসেছে। আষাঢ় এর সকাল ময়লা চাদরের মতো ছেয়ে রয়েছে বিপুলা ভাগীরথীর ওপর। দূরে জেলে ডিঙিগুলি ছোট ছোট পতঙ্গের মতো দৃশ্যমান। বল্লভ এক দৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে। ওদের ফেরার সময় হয়েছে। বর্ষার প্রথম ইলিশ বলে কথা। সর্ষে বাটা, ভাজা, মাথা দিয়ে কচুর শাক . . . নাহ, আজকে মাছ না নিয়ে সে ঘরে যাবে না। ডিঙি গুলি ধীরে ধীরে ঘাটের কাছে এগিয়ে আসছে, হাল ধরে থাকা বৃদ্ধ মাঝি এখন স্পষ্ট দৃশ্যমান।

কিন্তু সবকিছু কেন যেন স্বাভাবিক নয়। বুড়ো মাঝি উত্তেজিত ভাবে কিছু একটা চেঁচিয়ে বলছে, সঙ্গী মাঝিরাও একই রকম উত্তেজিত। বল্লভ ঘাটের শেষ ধাপ অবধি নেমে এসে দাঁড়ালো। নৌকা ঘাটে লাগতেই মাঝির সঙ্গী লাফ দিয়ে নেমে নৌকা বাঁধতে আরম্ভ করলো। বল্লভ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো 'ব্যাপার কি ? মাছ কোথায় ?'

'কথার জবাব না দিয়ে বুড়ো আঙুল দেখালো নৌকার পাটাতনের ওপর। একরাশ মাছ ধরার জাল একসাথে জড়ো করা, ভাঙা ডালপালা, আবর্জনা, দু চারটে মাছ এর সাথে ওটা কি ? একপা এগিয়ে দেখতে গিয়ে আঁতকে উঠে বল্লভ উল্টো দিকে ছুট লাগাল।

পর্ব তিন

অষ্টমঙ্গলায় বাড়ি ফিরে মালতী মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে বসলো। মালতীর বয়েস চোদ্দো। ফর্সা, তন্বী, টানা টানা চোখ। বামুনের ঘরের পক্ষে একটু বেশি বয়সেই তার বিয়ে হয়েছে।

তার বাবা বলরাম নগরের একজন নামকরা জ্যোতিষ। একটিমাত্র মেয়ের বিয়ে তিনি যেমন তেমন পাত্রের কাছে দেবেন না। পাণিপ্রার্থীর অভাব ছিল না। কিন্তু কোষ্ঠী মেলে না। মেয়ের বিয়ের আশা যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, তখন নগর কোটাল বীরভদ্র একজনের খোঁজ দিলেন। ছেলেটি বুদ্ধিমান, বণিকরা তার কাছে আসে ব্যবসার হিসাব বুঝতে। ছেলেটি একাই নগরে থাকে। এখনো অবিবাহিত।

ঘটনাচক্রে তার জন্ম তারিখ আর জন্মস্থান বীরভদ্রের জানা ছিল। বলরাম সেই রাত্রেই কোষ্ঠি বিচার করতে বসলেন। আর আশ্চর্য, এ যে রাজ জোটক।

নগরে দূর থেকে ছেলেটিকে দেখে তার বেশ ভালোই লাগল। সুদর্শন, গৌরবর্ণ যুবাপুরুষ। ছেলেটির মাতা পিতা দীর্ঘদিন গত হয়েছেন। তাই তার তরফে বীরভদ্রই কথা বার্তা বললেন। বলরাম আর দেরি করেন নি। শুভ দিন দেখে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের দিন সব কাজ মিটে যাবার পর শ্রান্ত বলরাম শোবার ঘরে ঢুকে দেখলেন স্ত্রী হাপুস নয়নে কাঁদছে। তিনি কন্যাদায় নিয়ে শাস্ত্রে কি বলেছে বলতে গিয়ে ধমক খেয়ে চুপ করে গেলেন। স্ত্রীর কাছে সব শুনে বলরাম কপালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বর বাঙাল।

পর্ব চার

অভিজ্ঞান আনমনে খাটের উপর বসে পইতেটা গিঁট দিচ্ছে আর খুলছে। তার মন ভালো নেই। মালতীকে সে নদীর ঘাটে দেখেছিল। তার পঁচিশ বছর বয়স অবধি আর কাউকে দেখে এত ভাল লাগেনি। খোঁজ খবর করতে বেশি সময় লাগেনি। বলরাম মেয়ের কোষ্ঠী আরো কয়েকজন জ্যোতিষীকে দেখিয়ে ছিলেন। তাই জোটক বিচার করে মানানসই আরেকটি কোষ্ঠী নিজের জন্য বানাতেও বেশি বেগ পেতে হয়নি। রাজস্ব সংক্রান্ত কিছু জটিল ব্যাপারে বীরভদ্র তার সাহায্য নিয়েছিল, তাই সে সানন্দেই ঘটক হতে রাজি হয়েছিল। সবই ঠিক ছিল, কিন্তু বাসর ঘরে পৌঁছে তার আনন্দ আর বাঁধ মানেনি। ঘরভর্তি মেয়েদের মাঝে সে মালিনী কে সাদর সম্ভাষণ করে নিজের পাশে বসতে বলে। মালতীর চোখে বিস্ময় আর প্রতিবেশিনীদের হাসিতে সে যখন সম্বিৎ ফিরে পেল, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। মালতী তার পর থেকে তার সাথে আর একটি কথাও বলেনি। বীরভদ্র বলরামকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। শ্বশুর মশাই তার সাথে কথা বলেন না। মালতীকে ঘরে ঢুকতে দেখে অভিজ্ঞান-এর চিন্তার জাল ছিন্ন হলো। মালতী একটি কাঁসার ঘটিতে জল আর আরেকটি ছোট কাঁসার বাটিতে নাড়ু নিয়ে এসেছে। তার সামনে নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে চলে যাওয়ার আগে অভিজ্ঞান মালতীর হাত ধরে ফেলল। 'আমার সাথে কথা বলছো না কেন?'

কোনো উত্তর নেই। 'আমায় তুমি পছন্দ করোনা? এই প্রশ্নের উত্তরে টপ করে একফোঁটা গরম জল অভিজ্ঞান-এর হাতে পড়লো। 'কাঁদছো কেন? আমি এমন কি খারাপ! দেশ বিদেশের বনিকেরা আমার কাছে আসে হিসাব বুঝতে। আমার নিজের বাড়ি আছে নগরে, তাতে কাজের লোকের অভাব নেই। তুমি রানীর মতো থাকবে। আমি কথাও তো তোমার মত করেই বলি। সেদিন হঠাৎ . . . .' এই অবধি বলেই অভিজ্ঞান চুপ করে গেল। বেশি কথা বলা তার অভ্যেস নয়। মালতী এতক্ষণ চুপ করে ছিলো। এবার হাত ছাড়িয়ে এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হতাশ ও আহত অভিজ্ঞান উত্তরীয়টা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। উঠোন ফাঁকা, কাউকে কিছু না বলে সে দ্রুত পায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। খানিকদূর উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে হাঁটার পর পিছন থেকে ডাক শুনে ঘুরে দেখে বল্লভ। বল্লভ তার কর্মচারী। 'কৃষ্ণাপ্পা, সেই যে হাতির দাঁতের ব্যবসায়ী, সে মরে গেছে'। 'সে কি! কি করে? কখন?'

'তা জানিনা, নদীর ঘাটে গিয়েছিলাম মাছ কিনতে, দেখি জেলেদের জালে মরা মানুষ উঠেছে, কাছে গিয়ে দেখি কৃষ্ণাপ্পা। চান করতে নদীতে নেমেছিল হয়তো, তলিয়ে গেছে।' অভিজ্ঞান শুনে অবাক হলো। কৃষ্ণাপ্পা দু এক দিন আগেই তার কাছে এসেছিল ব্যবসার লাভ লোকসান বুঝে নেবার জন্য। এবার লাভ তার বেশ ভালোই হয়েছে। সামগ্রী একটিও আর পড়ে নেই। হঠাৎ কি হলো! অভিজ্ঞান বলল 'চল এগিয়ে গিয়ে দেখি'।

নদীর ঘাটে যখন তারা পৌঁছলো, তখন ছোট খাটো একটা ভীড় জমে গেছে। কৃষ্ণাপ্পার দেহ একটা কাপড়ে মুড়ে বাঁশের সাথে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার তোরজোড় চলছে। বীরভদ্রের কাছে যাতায়াত আছে বলে পেয়াদারা প্রায় সবাই তাকে চেনে। অভিজ্ঞান এর অনুরোধে কৃষ্ণাপ্পার শরীর থেকে কাপড় তারা সরিয়ে নিল। জলে ডুবে চামড়া শিথিল হয়ে গেছে। মুখে যন্ত্রণার কোনো অভিব্যাক্তি নেই। অভিজ্ঞান এর দৃষ্টি মুখ থেকে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামলো। হাতের চামড়া কুঁচকে গেছে। অভিজ্ঞান পেয়াদার দিকে তাকিয়ে বলল "মৃতের শরীর থেকে কিছু পেয়েছ ? যেমন আংটি, স্বর্ণমুদ্রা, . . . "পেয়াদা সবেগে মাথা নাড়িয়ে জবাব দিলো পায়নি। অভিজ্ঞান এর মনে পড়লো তার সাথে কাজ শেষ হবার পরে কৃষ্ণাপ্পা তার পারিশ্রমিক কোমরে শক্ত করে বাঁধা একটি থলে থেকে বার করেছিল। "কাউকে বিশ্বাস নেই, তাই সর্বদাই সঙ্গে রাখি", তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে কৃষ্ণাপ্পা জানিয়েছিল। তার বাঁহাতে কাল পাথরের একটি আংটি ছিল। তার ওপর সোনা দিয়ে বিজাতীয় ভাষায় কিছু লেখা। "যতুমূদ্রা বলে আলাদা করে কিছু রাখিনি, আমার নাম এই আংটিতে খোদাই করা, এই দিয়েই কাজ চালাই"। কৃষ্ণাপ্পার বাঁ হাতের মধ্যমা খালি। অভিজ্ঞান এর চোয়াল শক্ত হলো। "নগর কোটাল মশাইকে খবর দাও, জরুরি দরকার, তিনি যেন প্রধান বৈদ্য মশাই এর বাড়িতে আসেন। তোমরা দেহটাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাও, আমিও আসছি।"

প্রধান বৈদ্য দণ্ডপানি বয়স্ক ব্যক্তি। নিজের বাড়িতেই রুগী দ্যাখেন। নিজেই ওষুধ দেন। পেয়াদারা মৃতদেহ নিয়ে যখন সেখানে পৌঁছল, তখন বীরভদ্র পৌঁছননি। অভিজ্ঞান তাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে ভিতরে গেল। দণ্ডপানি এক ব্যক্তির ক্ষত ধুয়ে তাতে ঘীর প্রলেপ লাগাচ্ছিলেন। অভিজ্ঞান সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে তার সামনে দাঁড়ালো। "তোমায় কোথায় যেন দেখেছি . . . .?" "আজ্ঞে নগর কোটাল মশাই এর বাড়িতে, উনি আমায় খুবই স্নেহ করেন।" "ও, তা এখানে কি মনে করে, তুমি তো রুগী নও বাপু, আমি কিন্তু রুগী দেখতে বাইরে যাইনা, সে অনুরোধ করোনা।" অভিজ্ঞান দণ্ডপানির পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দেখে চমৎকৃত হলো। সে ঠিক লোকের কাছে এসেছে। "আজ্ঞে একটি সমস্যায় পড়ে আপনার কাছে আসা, আমি শুনেছি মৃত ব্যক্তির শরীরের অবস্থা দেখে মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করা সম্ভব, তা কি ঠিক ?" দণ্ডপানি এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলেন না, কিন্তু তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। অভিজ্ঞান আর দেরি না করে তার সাথে কৃষ্ণাপ্পার আলাপ থেকে শুরু করে আজ সকালের ঘটনা অবধি দণ্ডপানিকে বলতে শুরু করল। ইতি মধ্যে বীরভদ্র প্রবেশ করেছেন। অভিজ্ঞান-এর বক্তব্য শেষ হবার পরে দণ্ডপানি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন "চল, দেখি, কতদূর পারি...." কৃষ্ণাপ্পার মৃতদেহটিকে দণ্ডপানি অনেক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন "নিশ্চিত করে বলতে পারিনা, তবে সম্ভবত দশ থেকে এগার দন্ড আগে মৃত্যু হয়েছে, আর আরেকটি কথা। মৃত্যুর কারণ কিন্তু জলে ডোবা নয়। আগে হত্যা করা হয়েছে, তারপর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।"

পর্ব পাঁচ

কোতোয়ালিতে পেয়াদারা জেলে নৌকার মাঝিকে হাজির করেছে। বুড়ো ভয়ে প্রায় আধমরা। বীরভদ্রের প্রশ্নের উত্তরে সে জানালো কাল রাতে চাঁদ ওঠার পরে তারা নদীর ঘাট থেকে রওয়ানা দিয়েছিল। তখন ভাঁটা, তাই দাঁড় বেয়ে নদীর মাঝখানে পৌঁছে তারা জাল ফেলেছিল। তখনও সূর্য উঠতে অনেক দেরি। সবে যখন ভোর হচ্ছে তখন জাল পরীক্ষা করতে গিয়ে তারা মৃতদেহটিকে দেখে। "সে তো বুঝলাম, কিন্তু কোঁচর থেকে টাকা গুলো সরালে কেন ? তারপর আংটিটাও তো গায়েব করেছ !" বীরভদ্রের প্রশ্নের উত্তরে বুড়ো মাঝি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে নানান দেব দেবীর শপথ নিতে লাগলো, সে কিছু নেয় নি, যদি সে মিথ্যা বলে তবে যেন তার চোদ্দ পুরুষ ইত্যাদি ইত্যাদি। বীরভদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে অভিজ্ঞান কে বললেন "সত্যি বলছে"।

পর্ব ছয়

নদীর প্রধান ঘাট থেকে দু দিকে প্রায় দু ক্রোশ অবধি রাজপথ গেছে। তারপর রাজপথ আর নেই। গ্রাম্য পায়ে চলা পথ আরো কিছুদূর গেছে। তারপর জনবসতি নেই। নদীতে ভাঁটার সময় হিসেব করে বীরভদ্রের লোকেরা নদীর পাড় ঘেষে যত বাড়ি আছে সবেতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করল। সমস্ত শুঁড়িখানা, গণিকালয় সব জায়গায় খোঁজ নেওয়া হলো। প্রায় সাতদিন ধরে প্রচুর চেষ্টা করেও কোন খবর পাওয়া গেলোনা। কেউই দেখেনি কোনো বিদেশি কে নদীতে চান করতে বা নদীর ধার দিয়ে যেতে। ইতিমধ্যে কিছু পারসিক বণিক সওদা নিয়ে হাজির হয়েছে। তাদের চেহারা, আচার আচরণ সন্দেহজনক। বীরভদ্র তার লোকজন নিয়ে নতুন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণাপ্পার কথা আর তার মাথায় রইলো না।

পর্ব সাত

শ্বশুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে অভিজ্ঞান আর সেখানে ফিরে যায়নি। বল্লভকে পাঠিয়েছিল মালতীকে নিয়ে আসার জন্য। মালতী আসেনি। অভিজ্ঞানও জোর করে নি। দিন আগের মতোই কেটে যাচ্ছে। মালতী পুজো নিয়ে ব্যস্ত থাকে, মাকে ঘরের কাজে সাহায্য করে। বলরাম মেয়েকে দ্যাখেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। এ কেমন ছেলে! নিজের বউকে অবধি জোর করতে পারে না। মালতীর মা কয়েকবার চেষ্টা করেছেন মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শ্বশুর বাড়ি দিয়ে আসবার, কিন্তু পারেননি। আষাঢ় শেষ হয়েছে, শ্রাবণ শেষ হবার পথে। আকাশ জুড়ে কালো মেঘ শ্রাবণের সকালকে ম্রিয়মান করে রেখেছে। ধবলীকে মাঠে বেঁধে মালতী চললো কলসি কাঁখে নদীতে। তার বাড়ি থেকে নদী বেশি দূরে নয়। গ্রামের মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে একটি ঘাট বানিয়ে রেখেছে। চান ও পান উভয় কাজেই ভাগীরথীর জল ব্যবহার হয়। গ্রাম্য বধূরা সকাল সন্ধে চান করতে ঘাটে আসে, সখীরা বরের প্রশংসা, শাশুড়ির নিন্দে, প্রতিবেশিনীর অনাচার নিয়ে প্রাণ খুলে কথা বলে, জল ভরে যে যার বাড়ি ফিরে যায়। বিয়ের আগে মালতীর ঘাটে যাবার সময় তার বাকি বান্ধবীদের সাথে মেলানো ছিল।

তার বান্ধবীদের সবার বিয়ে হয়ে গেছে। সবাই যে যার শ্বশুর বাড়িতে থাকে। সমবয়সী আর যারা আছে তারা ভিন গাঁয়ের, বিয়ে হয়ে এসেছে। সে স্বামীপরিত্যক্তা, এটা গ্রামীণ সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতাকে অনেকাংশে হ্রাস করেছিল। মালতী এদের এড়িয়ে চলত। তাই সে বেশিরভাগ সময় একাই ঘাটে আসত। ঘাটে পৌঁছে মালতী কলসী নামিয়ে জলে পা ডুবিয়ে বসল। ঘোলা জল ঘাটের কাছে বাধা পেয়ে ধীরে বয়ে চলেছে। একা আনমনে সে যুক্তি তর্কের জাল বুনে চলে। তার কি দোষ, তার বর বাঙাল বলে হাসাহাসি করলে তার দুঃখ হবে না! তাই বলে তাকে ফেলে রেখে চলে যেতে হবে! সে তো অভিজ্ঞানকে কিছু বলে নি। তাহলে নিজে না এসে লোক পাঠালো কেন! সে কি এতোই ফেলনা। যাবে না, সে কক্ষণো যাবে না। থাক একা, একা । যতই অভিজ্ঞানের ওপর তার রাগ বাড়তে থাকল, ততই তার করুণ মিনতি মালতীর কানে অনুরণিত হতে থাকলো। মালতী ঘাটের সিঁড়ির উপর রাখা কলসিতে মাথা রেখে কাঁদতে থাকলো। তার হুঁশ ফিরলো পিছনে পায়ের শব্দ শুনে। আরেকটি মেয়ে এসেছে জল ভরতে। মেয়েটিকে সে আগে দেখেনি। তার দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে মেয়েটি বললো "কোন বাড়ির বউ গো তুমি, একা বসে আছো !" কথার জবাব না দিয়ে মালতী তাড়াতাড়ি কলসী নিয়ে নদীতে নেমে জল ভরতে লাগলো। জল ভরে ওঠার সময় মালতী দেখলো মেয়েটি তখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে। আর এড়িয়ে যাওয়া যায়না। মালতী অল্প হেসে বললো "আমি বামুনপাড়ায় থাকি, তুমি কোথায় থাকো ? তোমায় তো আগে দেখিনি।" মেয়েটি যেন কথা বলার জন্য হাঁপিয়ে গিয়েছিল। তরতর করে এক গাদা কথা বলে চললো, তার বাড়ি নদীর পাশেই, সে আর তার বর – দুজনের সংসার আর কেউ নেই। এখানে তারা নতুন এসেছে, কারুর সাথে যে একটু কথা বলবে সে রকম কোনো লোক নেই। মালতী হেসে জিজ্ঞেস করল " তা তোমার নাম কি ?" মেয়েটি হেসে বলল "সনকা"।

পর্ব আট

আজ ব্যবসা একটু কম। দু-চারজন রোজের খদ্দের, একজন কপর্দকহীন মাতাল আর এক বুড়ো ভিখিরি কে বিদায় দেওয়ার পর ভূরিপালের হাতে আর কাজ রইলো না। টুক টাক একটু গুছিয়ে নিয়ে সে শুড়িখানার ঝাঁপ ফেলে দিলো। বেলা হয়েছে। এবার খেয়ে দেয়ে সে একটু বিশ্রাম নেবে। নিজের কুটিরে পৌঁছে সে দেখল সনকা তার গয়নার বাক্স নিয়ে

বসেছে। বউটা তার ভাল। যা সে বলে তাই করে। শুধু মদিরা, গৌড়ী, মাধ্বী, আসবে আজকাল আর চলেনা। তৃষ্ণা তো আর শুধু রসনার নয়। তাই সনকা মাঝে মধ্যে মাছের ডিম ভাজা নিয়ে আসরে প্রবেশ করে। ভূরিপাল বুঝতে পারে বাড়ি থেকে লুকিয়ে আসা প্রথম বারের আনাড়ি আর পাঁড় মাতাল, উভয়ের ক্ষেত্রেই এ আকর্ষণ অমোঘ। ব্যবসা তার ভালোই চলছে।

সনকা তার পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে তাকালো। "জানো, আমার সাথে ঘাটে একটা মেয়ের আলাপ হয়েছে। আমরা সই পাতিয়েছি। আমার থেকে ছোট, বিয়ে হয়েছে, কিন্তু বর নেয় না।" এখানে এসে থেকে সনকার বন্ধু জোটে নি। শুঁড়ির বউয়ের সাথে গ্রামের মেয়েরা আলাপ জমাতে রাজি হয়নি। বেচারি মনমরা হয়ে থাকে। উৎসাহ দেখিয়ে ভূরিপাল বলল "বাঃ, খুব ভাল, তবে দেখিস, তুই আবার .....!" সনকা হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল, "জান, সই এর গলায় কি সুন্দর একটা হার, আমার একটাও হার নেই, যাওনা শ্যাকরার কাছে, তোমার কাছে তো ..." । ভূরিপাল প্রমাদ গুনল। হঠাৎ করে সোনা কিনলে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে, যদি কোনোরকমে পেয়াদার কানে কথা ওঠে তাহলে বিপদ। "আর কটা দিন যাক না, তারপর আমরা এখান থেকে দূরে কোথাও চলে যাব, তখন তুই যা চাইবি তাই ...." সনকা সশব্দে বাক্সের ঢাকা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো, "ভাত ঢাকা আছে, খেয়ে নিও" । তার মুখ শ্রাবণের আকাশের মতোই কাল হয়ে উঠেছে। এ আবার কি ঝামেলা! ভূরিপাল খানিক চিন্তা করে বললো "আমার কাছে একটা আংটি আছে, সেই যে রে বণিকের হাতে ছিল, সেটার পাথরের ওপর খুব সুন্দর নকশা কাটা, সেটার পাথরটা তোর গলার হারের সাথে গেঁথে দি, খুব সুন্দর হবে।" সনকা বসে পড়ে ভুরিপালের গলা জড়িয়ে ধরল।

পর্ব নয়

অভিজ্ঞান ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে তাদের হিসাব সরলীকরণ করতে, লাভ-লোকসান বুঝিয়ে দিতে। কিন্তু মিথ্যা বলে রাজশুল্ক ফাঁকি দেওয়া সে মোটেই পছন্দ করেনা। সে এই ব্যাপারে কাউকে কোনো রকম মন্ত্রণা দেয়না। সুদূর পশ্চিম থেকে আসা স্থূলকায় এই বণিক সেকথা মানতে নারাজ। সে চায় মোটা টাকা শুল্ক ফাঁকি দিতে, খালি হিসেবটি দেখতে যেন পাকা হয়। অভিজ্ঞানের সুনামকে সে এই ব্যাপারে কাজে লাগাতে চায়। বারংবার না করার পরেও সে লেগে আছে, তার ধারণা দুটি রৌপ্য মূদ্রার বদলে তিনটি দিলে অভিজ্ঞান নিশ্চয় রাজি হবে। বিরক্ত অভিজ্ঞান রূঢ় প্রত্যাখ্যান করার পরেও লোকটি হাল ছাড়েনি। লোকটিকে ঘাড় ধাক্কা দেবে বলে সে যখন মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন বীরভদ্র তার ঘরে ঢুকল। "আরে হরিদাস, এখানেও জুটেছ দেখছি, তা তোমার লোকজনেরা আমার কাছে এসেছিল নালিশ নিয়ে, তুমি নাকি তাদের দু হপ্তার মজুরি বাকি রেখেছ, কিছুতেই দিচ্ছনা! কি ব্যাপার, ফাঁকি দিতে চাও নাকি?" হরিদাস মাখনের মত গলে গিয়ে বিগলিত স্বরে জানাল আজকেই বেতন দেওয়া হবে। তারপর জোড়হস্তে বীরভদ্রকে নমস্কার করে দ্রুত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে অভিজ্ঞান বললো "আপদ বিদায়" । বীরভদ্র হেসে বললো "এত অল্পে মাথা গরম করলে চলবে নাকি ! শোনো, তোমার একটু সাহায্য লাগবে। কাল হাটে মারামারি হয়েছে শুনেছ? দু দল গুড় ব্যবসায়ী লাঠি নিয়ে পরস্পরের মাথা ফাটাবার তালে ছিল, মধ্যস্থতা করতে গিয়ে দু একজন জখম হয়েছে। দু দলের সঙ্গে একটু বসা দরকার, যাবে নাকি, কারবারী দের গ্রাম তোমার শ্বশুর বাড়ীর কাছাকাছি।" অভিজ্ঞান এই ক'দিন ক্রমাগত ভেবে চলেছে মালতীর কথা। বার বার ইচ্ছা হয়েছে মালতীর সঙ্গে দেখা করার। কিন্তু প্রতিবারই সে নিজেকে সংযত করেছে। যে তীব্র অপমান তাকে সইতে হয়েছে, তার গ্লানি সে এখন ভুলতে পারে নি। তার একবার মনে হলো কোনো অজুহাতে সে না করে দ্যায়, কিন্তু বীরভদ্র তার উপকারী বন্ধু। সে আর না করতে পারলো না। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে সে বীরভদ্রের সাথে রওয়ানা দিলো। নদীর ধার ঘেঁষে পায়েচলা রাস্তা। বর্ষার জল পড়ে কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল। গ্রামের কাছে পৌঁছে বীরভদ্র আর অভিজ্ঞান দুজনই একমত হলো যে হাত-পা না ধুয়ে গ্রামে ঢোকা ঠিক হবে না। অল্প দূরে নদীর ঘাট দেখা যাচ্ছে। দুজনে রাস্তা ছেড়ে ঘাটের দিকে রওয়ানা দিলো।

সনকা নদী থেকে হাতের কোষে জল তুলে কলসির গা মাজতে মাজতে বলল "আমার বর কিন্তু আমায় খুব ভালোবাসে, আমায় ছাড়া ওর চলেনা। আমি যা চাইব তাই এনে দেবে, যেখান থেকে পারুক। এই তো দেখোনা, সে দিন বলেছি আমায় একছড়া হার এনে দিতে, তা আজকে দেখি এনে হাজির করেছে। তার মাঝে আবার কালো নকশা করা পাথর। এই দ্যাখো"। মালতী দীর্ঘশ্বাস চেপে বললো "বাঃ, বেশ সুন্দর।" শুধু এটুকু প্রশংসায় সনকার মন ভরল না। সে গলা থেকে হারটা খুলে মালতীর হাতে দিয়ে বলল "পাথরের ওপর সোনার নকশা করা, কি সুন্দর না !" মালতী হারটা হাতে নিয়ে কিছু বলার আগেই পিছনে পুরুষ কণ্ঠের মৃদু গলা খাকরানি শুনে চমকে ফিরে তাকালো। তার হৃদস্পন্দন মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে হঠাৎ অতি দ্রুত বেগে চলতে আরম্ভ করল। ঘাটের সিঁড়িতে অভিজ্ঞান আর বীরভদ্র দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঘাটে মহিলারা থাকলে তাদের সাবধান না করে হঠাৎ উপস্থিতি শালীনতা বিরোধী। অভিজ্ঞান আর বীরভদ্র নদীর ঘাটে গিয়ে দেখে দুটি মেয়ে নদীর জলে পা ডুবিয়ে গল্পে মগ্ন। তারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রইল। কিন্তু এই দুজনের গল্প আর ফুরয়না। বিরক্ত বীরভদ্র তাই একধাপ নেমে একটি মৃদু কাশির শব্দ করেছিল। অভিজ্ঞান মালতীকে এখানে অসময়ে একবারের জন্যেও প্রত্যাশা করেনি। মালতী আরক্ত মুখ ঝটিতি ঘোমটায় ঢেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর দ্রুত পায়ে অভিজ্ঞানের পাস কাটিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। বীরভদ্র অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি অভিজ্ঞানের পাঁজরে একটা খোঁচা দিয়ে বললেন "দেখছ কি ! যাও !" কিংকর্তব্যবিমূঢ় অভিজ্ঞান হুঁশ ফিরে পেয়ে দ্রুত পায়ে কিছুদূর গিয়ে মালতীকে ধরে ফেলল। মুখোমুখি দুজন দাঁড়িয়ে কিন্তু কোনো কথা নেই। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে অভিজ্ঞান বললো "কেমন আছ ?" মালতীর কান্না আর বাধা মানল না। "কেন আমায় ফেলে চলে গেলে? আমি কি করেছি ....." ইত্যাদি ইত্যাদি, সাথে অঝোর ধারে অশ্রু বর্ষণ। অভিজ্ঞানের যত শানিত যুক্তি, অভিমান সবই সেই অশ্রুধারায় ধুয়ে গেল। দু চারবার সে মুখ খুলেছিল, কিন্ত কিছুই বলে উঠতে পারেনি। অবশেষে মালতী একটু ধাতস্থ হলে অভিজ্ঞান বললো "তাহলে এখন চলো, আমি পালকি ডেকে আনি।" ইতিমধ্যে বীরভদ্র ও তার পিছনে পিছনে মালতীর সঙ্গিনী এসে দাঁড়িয়েছে। বীরভদ্র সহাস্যে বললেন "এই তো, মিল হয়েছে দেখছি, এবার তাহলে নায়িকা কে নিয়ে প্রস্থান করতে হয় !" লজ্জিত অভিজ্ঞান বললো "আমি পালকি আনতে যাচ্ছি"। বীরভদ্র সহাস্যে বললেন "ওই কাজটা বরং আমিই করছি, তুমি হলে জামাই মানুষ, তোমার কি আর পালকি ডাকতে যাওয়া সাজে !" সনকা এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। সে বুঝতে পেরেছিল অভিজ্ঞান আর কেউ নয় মালতীর স্বামী। এবার সে এগিয়ে এসে কাঁখের কলসী নামিয়ে মালতীর হাত ধরল। মালতী হেসে বললো "এই যে আমার সই, সনকা। এই ঘাটের কাছেই ওর বাড়ি। আমরা রোজ একসাথে ঘাটে যাই আর খুব গল্প করি"। অভিজ্ঞান সসম্ভ্রমে হাতজোড় করে নমস্কার জানালে সনকা ঘোমটার আড়াল থেকেই হাতজোড় করে প্রতিনমস্কার জানাল। মালতীর হাত ধরে বলল "আমি এখন যাই সই, ঘরে কাজ আছে, আমার হারটা ....."। "দেখেছ কাণ্ড, ভুল করে হাতে নিয়েই চলে এসেছি। এই নাও।" মালতী হাসি মুখে সনকার হাতে হারটি তুলে দিল। অভিজ্ঞান দেখলো সোনার হারের মাঝে একটি কাল পাথর, তার ওপর সোনা দিয়ে নক্সা কাটা। কাল পাথরের ওপরের নকশা টা খুব চেনা। কোথায় দেখেছি ....., অভিজ্ঞানের হুঁশ ফিরল মালতীর কথায়, "মা খুব খুশী হবে, জান আমাদের বাড়িতে না ....."

অভিজ্ঞান মালতীর পাশে হাঁটতে শুরু করল। বহুদিন পরে সে ভীষণ ভীষণ খুশি।

## পর্ব দশ

হরিদাসের মেজাজ খুব খারাপ। কতকগুলি মজুর, তাদের কিনা এত সাহস তার বিরুদ্ধে নালিশ করে ! আর জুটেছে এক কতোয়াল, তাকে হুমকি দিচ্ছে এত বড় সাহস। এরা জানেনা হরিদাসের ক্ষমতা কতদূর। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত রয়েছে অভিজ্ঞান। সবেতেই না। আরে তোরও তো লাভ ছিল সেটা ভাববি না ! বিরক্ত হরিদাস সামনে রাখা মদিরার পাত্র টিকে এক চুমুকে খালি করে ফেললো। এত সহজে সে ছাড়বে না। আধশোয়া হরিদাস মদিরার পাত্রটি হাতে নিয়ে দেখলো আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বিকৃত স্বরে সে হাঁক পাড়লো "আরেক পাত্র, তাড়াতাড়ি"। দুপুর থেকে সে এখানে আছে। এখানকার শুঁড়িগুলো অবধি ফাঁকিবাজ। জোর করে সে শুঁড়িখানা খুলিয়েছে। দুটি রৌপ্যামুদ্রা শুঁড়ির সামনে ছুঁড়ে দিতে সে

আর আপত্তি করেনি। বেশ কয়েক পাত্র মদিরা সে পান করে ফেলেছে। তবু তার রাগ প্রশমিত হয় নি। এখনও আসছেনা কেন, এখানেও ফাঁকি বাজি, ক্রুদ্ধ হরিদাস তাকিয়ে দেখল সন্ধ্যা আসন্ন। শুঁড়িখানা ফাঁকা। একটু দূরে ভুরিপাল দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ক্রুর দৃষ্টি হরিদাসের কোমরে নিবদ্ধ। হরিদাসের মনে পড়লো তার কোমরে কর্মচারী দের বেতন, বেশ কিছু মুদ্রা বাঁধা রয়েছে। তার স্বভাবসতর্কতা ফিরে এল। "থাকগে আর দরকার নেই", এই বলে সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গেল। দ্রুত অথচ লঘু পায়ে ভুরিপাল তার দিকে এগিয়ে এল। তার হাতে একটা ছোট্ট লোহার ডান্ডা। হরিদাস আর্তনাদ করার চেষ্টা করল, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

পর্ব এগার

এবার অভিজ্ঞানের আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হয়নি। যদিও শ্বশুর মশাই একবার দেখা দিয়েই অদৃশ্য হয়েছেন। কিন্তু তা বলে যত্নের কোন অভাব হয়নি। দুপুরে রীতিমত গুরুভোজনের পর বীরভদ্র তাড়া লাগালেন। এখনই না বেরোলে বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে। তাছাড়া পালকি বেহারা রা অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে। মালতীর মা যতদূর সম্ভব মেয়েকে সাজিয়েছেন। সিঁথিতে টিকলি, কানে সোনার ঝুমকো, নাকে হীরে বসানো নাকছাবি, গলায় বকুল হার। অভিজ্ঞান মালতীর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলনা। তাদের রওয়ানা হতে হতে দুপুর গড়িয়ে গেল। মালতীকে নিয়ে পালকি যখন অভিজ্ঞানের বাড়ি পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

একটি সর্বক্ষণের ভৃত্য, একটি রাঁধুনী ও সহকারী বল্লভ তার সাথে থাকে। আগে থেকে খবর দেয়া ছিল না, তাই তারাও অপ্রস্তুত। বাড়িতে মহিলা কেউ নেই। বীরভদ্র নিজের বাড়িতে খবর পাঠালেন। বধূবরণের সরঞ্জাম নিয়ে তার স্ত্রী হাঁপাতে হাঁপাতে যখন পৌঁছলেন, তখন রাত হয়ে গেছে। মালতী তখনো পালকিতে বসে। প্রদীপের আলোয় বরণ করে মালতী আর অভিজ্ঞানকে নিয়ে বীরভদ্রের স্ত্রী বাড়িতে ঢুকলেন। তার লোকেরা এই টুকু সময়ের মধ্যেই ঘরটিকে যতদূর সম্ভব সাজিয়েছে। ঘরে ঢুকেই দেওয়াল জোড়া আয়না। ফুলের অভাবে ঘর জুড়ে সারি সারি মাটির প্রদীপ লাগানো হয়েছে। অভিজ্ঞান মুগ্ধ হয়ে মালতীর প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রদীপের আলোয় মালতীর সোনা আর হীরের নাকছাবি ঝলসে উঠেছে। চোখাচুখি হতেই প্রতিবিম্ব একটু হাসলো। সে হাসির কাছে হীরের ঝলকানি ম্লান। কিন্তু নাকের ডান দিকে তো হীরেটা ছিল। তাহলে প্রতিবিম্বে ..... । বিস্ফারিত চোখে অভিজ্ঞান আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। মালতীও অভিজ্ঞান এর প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়েছিল। মুগ্ধ সেও। কিন্তু একি! হঠাৎ অভিজ্ঞান-এর চোখমুখ এরকম বদলে গেল কেন ! বিস্মিত মালতী ফিরে দেখলো অভিজ্ঞান বীরভদ্রের হাত ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। বাইরে বহু লোকের গলার আওয়াজ। কারা যেন খুব উত্তেজিত হয়ে বীরভদ্রের নাম ধরে ডাকছে।

পর্ব বার

আফসোসে অভিজ্ঞানের হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছিল। কি নির্বোধ সে! আংটিতে নামতো উল্টো করে লেখা থাকবে। সে কৃষ্ণাপ্পার নাম গালার ওপর সোজা করে ছাপা দেখেছিল। তাই সনকার গলার হারের পাথরটা এত চেনা চেনা লাগছিল। আয়নায় মালতীর প্রতিবিম্ব দেখার পরেই তার কাছে ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায়। বাইরে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে। এরা হরিদাস এর কর্মচারী। হরিদাস নিখোঁজ। হরিদাসকে না পেয়ে তার খাজাঞ্চিকে এরা ধরে এনেছে বীরভদ্রের কাছে। খাজাঞ্চি হাত জোড় করে জানালো দুপুর নাগাদ কর্মচারীদের বেতন নিয়ে হরিদাস আড়ৎ থেকে বেরিয়েছে। তারপর থেকে তার আর খোঁজ নেই। অভিজ্ঞান শান্ত স্বরে বললো "আমি জানি হরিদাসকে কোথায় পাওয়া যাবে।"

নিঝুম রাত। নদীর ঘাট জনমানব শূন্য। আকাশের তারার আলোটুকু অবধি মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। পরিশ্রান্ত ভুরিপাল কপালের ঘাম মুছে সনকাকে বললো "শালা বড্ড ভারী, তবে এসে গেছি, ভাঁটা শুরু হয়ে গেছে, আর দেরি নয়। তুই পায়ের দিকটা একটু ধর, আর ক পা গেলেই নদী।" হঠাৎ কতকগুলি মশাল জ্বলে উঠলো। আতঙ্কিত ভুরিপাল দেখলো সামনে জনা পনেরো সশস্ত্র লোক। সনকার চিৎকারে পিছন ফিরে দেখলো সেখানেও মশাল। ছুটে পালাবার চেষ্টা করতেই বুকে একটা

তীক্ষ্ণ ধাতব স্পর্শ পেয়ে সে থমকে দাঁড়াল। মশালের কাঁপা কাঁপা আলোয় দেখলো বীরভদ্রের চোখ তার তরোয়ালের মতোই শানিত আর নির্দয়।

পর্ব তেরো

সকাল থাকতেই বলরাম বেরিয়েছেন। সেই যে মেয়েটা গেল তারপর থেকে কোনো খবর নেই। মেয়ের মা কেঁদে কেঁদে সারা। তিনি নিজেও বড় মনকষ্টে আছেন। একটি মাত্র মেয়ে সে কিনা পড়লো এক বাঙালের হাতে। একাধিক বার ভেবেছেন গিয়ে দেখে আসবেন। কিন্তু যে ছেলের সঙ্গে তিনি আজ অবধি কথা বলেন নি তার সামনে দাঁড়াতে বড় সংকোচ বোধ হচ্ছিল। আশ্বিন মাস পড়েছে। তার হৃদয়াবেগ আর বাধা মানেনি। তিনি মেয়েকে দেখতে নগরে এলেন। বাড়ির দরজাতেই অভিজ্ঞানের সাথে দেখা। "কি সৌভাগ্য, আসুন, আসুন" বলে মহাসমাদরে অভিজ্ঞান তাকে বাড়িতে ঢোকাল তার পর হাঁক দিল "কিগো, কই গ্যালা! কেডা আইসেন দেইখ্যা যাও", বলরাম চমৎকৃত হয়ে শুনলেন অন্দরমহল থেকে সুপরিচিত সুমিষ্ট স্বরে জবাব এলো "আইতাসী"।

---

**রজত ভট্টাচার্য**, নিভৃত সাহিত্যচর্চা আর দূর্গম পাহাড়ে ভ্রমণ তাঁর ভালোলাগা। গদ্য ও পদ্যে সমান দক্ষ। পেশায় কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মী। তাঁর গদ্যের অভিনব শৈলী বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে।

সাগরিকা রায়

# শীতের গোলাপ

বৃষ্টি থামতেই ভেজা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম । এখন কলেজ-ফেস্ট চলছে বলে খুব ব্যস্ততায় আছি। নেহাত আজ সানডে। ছুটি ছুটি বলে সকলে লাফায়। কিন্তু আমার ছুটি পছন্দই না। ছুটি মানে ঘরে বন্দী। বন্ধুদের সঙ্গে হা হা হি হি নেই ! ধ্যাৎ ! নিকি কি ঝাব্বুস জোকস জানে ! কয়েকটা বেশ আডাল্ট-মার্কা। তো আমরা কিছু বাচ্চা নই! যদিও আমি এখনও কারও প্রেমে পড়িনি। তার মানে পড়ব না এমনটাও না। স্মিত প্রপোজ করল বলে। ওর চোখ বলেই দিচ্ছে ওর মনের কথা। তাহলে ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে ই-বুকে চোখ গুঁজে থাকতে বা হেডফোন কানে নিয়ে কতক্ষণ আর কাটানো যায় ?

কিচেনে খুশুবুদার ডিশ হচ্ছে মনে হচ্ছে। আমার স্যালাড আর চিকেন রেডি হলেই মা ডাকবে। কিন্তু গন্ধটা বেশ সন্দেহজনক। নুচি হচ্চে নাকি ? এলাহাবাদের দিদুন বছরে একবার ঘুরে যান এখানে। থোম্বা মুখ, বিশাল ফিগার, গোলাপী প্রিন্টেড সিল্ক শাড়ি, হাতের মকরমুখী বালা নাড়িয়ে – হ্যাঁরে, নুচি হচ্চে নাকি ? বলতে বলতে রোদ ছড়ানো হাসি মুখময় যখন ছড়িয়ে দেন, বোঝাই যায়না উনি কলেজের রাশভারী প্রিন্সিপল। চিনেমাটির ডিনার প্লেটে করে গোটা ছয় নুচি অক্লেশে উড়িয়ে দিতে দিতে – তারপর ? তুমি ফিগার কনসাস নাকি ? বেশ। নট ব্যাড। বাট একটা নুচি খেয়ে দেখ। ওয়ার্ক আউট কর? বাঃ ! তাহলে এসে বসে পড়। আমি বসলাম কিনা দেখার সময় পেলেন না নেক্সট নুচির ধামাকায়।

কিচেনে উঁকি দিয়ে বুঝলাম সেই বিখ্যাত নুচিই হচ্চে।

– আয়। খাবি একটা ? মা সন্দেহজনকভাবে আমার জবাবের জন্য অপেক্ষা করে ।

আমি কিছু বলতে যাব, তখনই ডোর বেলটা বেজে উঠল – টিং টিং টং !

আর আমি বুঝে ফেললাম সৌমিত্র এসেছে। ইয়াপ ! সানডেটা দারুণ কাটবে। আরও বুঝলাম আজ কেন নুচি... না, নুচি না [সৌমিত্র লুচি বলে] লুচি হচ্ছে। সৌমিত্র আমার বাবার ছাত্র ছিল কলেজে লাইফে। সেই সূত্রে নিয়ম করে স্যারকে দেখতে আসে। ইস, স্যারকে দেখতেই কি শুধু ? সৌমিত্র আমার কথা ভাবে না ? জানি না। বুঝতে পারিনা ওকে। বেশি বড় বড় ভাব করে আমার সঙ্গে ! ধুস !

দরজা খুলতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। কালো টি, বেজ কালারের প্যান্টের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হেব্বি স্মার্ট সৌমিত্র ! বয়সটা আমার থেকে বেশি বলে আমি তাঁকে নাম ধরে ডাকতে পারব না এটা আবার কবে নিয়ম হল ?

– হ্যাল্লো ডিয়ার, গতকাল জিমে যাওনি কেন ? শরীর ভাল ? আমি তোমাকে না দেখে ভাবলাম ফোন করি ।

– করলে না কেন ?

– ভেতরে যাব ? সৌমিত্র চুলে হাত বুলিয়ে নিল ।

– অফকোর্স। এস। আমি সরে গিয়ে ঢুকতে দিলাম। সেই সঙ্গে চেঁচিয়ে ডাকলাম মাকে – মা, লুচি-খাদক এসে গেছে।

সৌমিত্র অল্প হেসে তাকাল আমার দিকে। আর আমার মনে হল ভূমিকম্প হল বুকের মধ্যে। এরকমই হচ্ছে কিছুদিন ধরে। কেন হচ্ছে জানি না। যেদিন জিমে ট্রেডমিলে দেখলাম, সেদিন শর্ট প্যান্ট আর জিম ভেস্ট পরা সৌমিত্রকে দারুণ

দেখাচ্ছিল। দারুণ স্মার্ট। সেদিনই আমি ঠিক করেছিলাম ওঁকে নাম ধরে ডাকবো। কেউ বুঝতেই পারেনা আমি নাম ধরে ডাকি মনে মনে । সৌমিত্রও কি জানে !

– জিনিয়া একটা ফুলের নাম। তোমাকে আজ সেই ফুলের মত দেখাচ্ছে। আরাম করে বসল সৌমিত্র ।

– তুমি আজ আসবে, বলনি তো !

– কী করে বলব ? জিমে যাওনি তো ! তাই খোঁজ নিতে এলাম।

– হু, বুঝেছি। তুমি আমার জন্য এসেছ ? বাবার সঙ্গে ফোনাফুনি হয়েছে ঠিক। দাবা খেলতে এসেছ তো ?

একটুও না হেসে গভীর চোখে আমার দিকে তাকাল সৌমিত্র – বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি তোমার জন্যই এসেছি ?

আমার মত টরটরে স্মার্ট মেয়ে বোকার মত তাকিয়ে থাকল সৌমিত্রর দিকে। সেই মেয়ের বুক কেঁপে উঠল কিনা সৌমিত্র বুঝতে পারল না ।

– জিনি, সৌমিত্রকে নিয়ে টেবিলে আয়। মা ডাকছিল ।

টেবিলে যাবেনা বলে দিল সৌমিত্র। এখন অয়েল ফ্রি চলছে ওঁর। মা তবু জুলুম করল – একটা ?

– না, ক্যালরি বাড়িয়ে লাভ নেই ! জিনিয়ার কী মত এ ব্যাপারে ? ও কি পুরো স্পাইসি খাচ্ছে নাকি ?

– মাথা ফাথা খারাপ নাকি তোমার ? উনি এখন সিদ্ধাই মা। সব সেদ্ধ। শুধু অলিভ অয়েলে হালকা ভেজে নেওয়া চিকেন পিস। ফিগার কনসাস আমরাও ছিলাম। কিন্তু এত না ।

– অসুবিধে কী ? এখনও ফিগার ভাল আপনার। মেনটেন করুণ। মেয়ের সঙ্গে চলে আসুন জিমে। সৌমিত্র সিরিয়াস। আর এতেই আমি ক্ষেপে গেলাম। সৌমিত্রর দিকে তাকিয়ে মা লাজুক চোখ নামিয়ে নিল – কী যে বল ! মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় হয়ে এল ! এখন যাচ্ছি জিমে ? মা খুব সাদাসিদে টাইপের মানুষ। সারাজীবন এডুকেশন ছাড়া আর কিছু বুঝল না। অথচ মা যে দারুণ সুন্দরী সেকথা মা যেন জানেই না !

লুচি খেল সৌমিত্র। বাবার সঙ্গে বাজেট নিয়ে আলোচনা করছিল খেতে খেতে। আমি টুক করে ওয়াশরুমে গিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখলাম । সত্যি কি ফুলের মত দেখাচ্ছে আমাকে ? জিনিয়া কি খুব সুন্দর ফুল ? আমার পছন্দ গোলাপ। সৌমিত্র যদি আমাকে গোলাপ বলতো, আমি বেশি খুশি হতাম ।

চিকেন স্যালাড খেতে গিয়ে মনে হল সৌমিত্রকে একটু দিই। খুশি হল। কাঁটায় গেঁথে চিকেন পিস মুখে তুলতে গিয়ে বাবাকে বলল – আপনারা কী করছেন ? দেখুন, আমি আপনাদের কন্যার বয়সের সঙ্গে তাল মেরে চলছি কেমন ! ফ্যাট খাবেন না । অফিসে সুন্দরী কোলিগ নেই ? তাদের জন্য তো নিজেকে ফিট রাখতে হয় ! একটু মুগ্ধ দৃষ্টি পেতে ইচ্ছে করে না?

বাবা হো হো হেসে উঠল। মা ভ্রু তুলে তাকাল সৌমিত্রর দিকে। বুঝেছি, সৌমিত্র এখন পুরো ঝাঁকি খাবে মার কাছে। খেলও। মা কপট বকুনি দিল – তুমি কার জন্য ফিট থাকছো গো ? বউ ? সে কি জিম করে ? তাঁকে নিয়ে যাও না !

বাবা হো হো করে হেসে উঠল ।

– ও বাবা, সহেলীর কথা বলবেন না। নটার আগে তো উনি শয্যা ত্যাগ করতেই পারেন না ! কিসের বা জিম, কিসের বা কী !

তিনজন গল্প জুড়েছে, আমিও আড্ডায় ঢুকে পড়তে পায়তারা কষছি, ঠিক তখনই এল স্মিতের ফোন। একটু দূরে চলে গিয়ে ফোনালাপ সেরে নিচ্ছি। এমন ভ্যানতাড়া করে ছেলেটা যে বলার না ! আর যখন তখন ফোন করবে! কী করছিস? কেমন আছিস? কলেজে আসছিস তো কাল? আজ আবার টেন্ডি ফ্যাশন নিয়ে শুরু করেছে। এবারে পুজোর সময় একদিন শোভাবাজার যাচ্ছি বলাতে খুব খুশি। ওদিকেই ওদের বাড়ি। বলল – একটা এথনিক ড্রেস পরিস।

আমার আর ওকে সময় দিতে ভাল লাগছিল না। ওদিকে সৌমিত্র অপেক্ষা করছে, এদিকে আমাকে স্মিতের বকবকানি শুনতে হচ্ছে ! একটু চালাকি করতে হল। স্মিতকে বলতে হল – স্মিত, একটা ফোন এসেছে। পরে কথা বলছি রে ! বলেই ফোন কেটে দিলাম। স্মিত এখন নিজের হাতে ধরা ফোনটার দিকে তাকিয়ে থাকবে কয়েক মুহূর্ত। মানস চোখ বলে একটা ব্যাপার আছে। সেই চোখে দেখে ফেললাম স্মিতকে! হি হি ! স্মিত কি ভালবাসে আমাকে ? সেদিন কলেজ স্ট্রিটে হেঁটে যাচ্ছি। ও বাদাম তুলে নিল ঠোঙা থেকে। একটু যেন আনমনা। আমি মেট্রো ধরার জন্য তাড়াহুড়ো করছিলাম। এখনও সময় আছে নাচের ক্লাস অ্যাটেন্ড করার। ফালতু সময় নষ্ট করে লাভ নেই। স্মিত আমার কথা শুনে হেসে দাঁড়িয়ে পড়ল ভিড় জমজম ফুটপাতে ।

– আমার সঙ্গে তুই কোয়ালিটি টাইম কাটাতে পারিস না ? অথচ ইদানিং তোকে অমোঘ মনে হচ্ছে কেন আমার ? আমি পড়াশোনায় মন দিতে পারছি না।

আমি তো স্মিতের দেবদাস মার্কা চোখ দেখে মাকালী হাসি সামলাতে পারলাম না। প্রাচীন যুগে এভাবে প্রেম আসতো। এই ডিজিটাল যুগে কি এমন ন্যাকা ন্যাকা প্রেম আসে ! পাগল !

ওর মাথায় চাটি মেরে দিলাম – যাও বাবা স্মিত। কোন মন্দিরে গিয়ে এবার কালী তোমায় খাব বলে ঠিক দু ঘন্টা নেচে যাও। দেখবি প্রেম ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে মাকালীর পেছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছে ! হিহিহি ! তুই তখন খাঁড়া মায়ের হাত থেকে নিয়ে প্রেমকে মারার জন্য তাড়া করবি। করে দেখ। সেটা না করে আরেকটা কাজ করতে পারিস কিন্তু ! তুই . . . হুম একটা সিঙ্গারা কিনবি ।

– মানে ? স্মিত বোকা চোখে তাকায় ।

– সিঙ্গারা কিনবি। দোকানে গিয়ে বলবি, দাদা, আমাকে তিনদিনের বাসি পচা সিঙ্গারা দিন। ওরা তোকে প্রথমে বা পরেও হয়তো পাগল ভেবে নেবে। তাতে ঘাবড়াবি না। কনভিন্স করার দায়িত্ব তোর। সিঙ্গারায় একটু কামড় দিয়ে . . . হ্যাক থু ! হ্যাক থু করতে করতে তুই ঠোঙা ফেলে দিবি। মিনারেল ওয়াটার কিনে খাবি ? না, তুই বই-এর দোকানের পাশের জলের কলে মুখ ধুতে যাবি। মুখে জল নিয়ে কুলকুচো করবি – ও ও গুলু গুলু গুলু ঝোয়াঃ ! . . . আমার মামাকে দেখেচি এরম করে মুখ ধুতে বুঝলি ? মনের পাপ, তাপ, কামনা, বাসনা সব ওই ঝোয়াঃর সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যায় ।

স্মিত চুপ করে শুনে যাচ্ছিল। আমি থামতেই জিজ্ঞাসা করল – তোর মামারও কি প্রেম ত্যাগ করার মত অবস্থা হয়েছিল? এই বুদ্ধি কি তোর দেওয়া ?

– আরে না ! আমার মামা একটা ভন্ড সাধুর পাল্লায় পড়েছিল। এমন ভক্তি যে সহ্য করা যাচ্ছিল না। শেষে জানা গেল মামা গৃহত্যাগ করবে। মানে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে। কারও কথা শুনছে না। যথার্থ হিপনোটাইজড। সেই সময় একটা বাসি পচা সিঙ্গারা মামাকে বাঁচিয়ে দিল ।

– মানে ?

– মানে, সাধুর সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরছে মামা। কিপটে প্রসূনের সঙ্গে দেখা মোড়ের মাথায়। প্রসূন ঠোঙা থেকে সিঙ্গারা বের করে মামাকে দিয়েছে । কিপটের দান ! সিঙ্গারায় কামড় দিয়েই মামা হ্যাক থু ! সমস্ত শরীর ঝাঁকুনি দিয়ে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামিয়ে দিল মামাকে । বাড়ি ফিরে এক গলা জল মুখে নিয়ে ও ও গুলু গুলু ঝোয়াঃ ! এখন সেই মামার দুটো ছেলে। মামীর কাছে বকা ঝকা খায় আরাম করে। কিন্তু গুলু গুলু ঝোয়াঃ ছাড়েনি। বলে ভন্ডর হাত থেকে বাঁচিয়েছে পচা মালটা। ওর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই গুলু গুলু করে। বুঝলি ?

স্মিত কী বুঝেছিল কে জানে। পেছন ছাড়ছে না।

– আরে ফুলটুসি, এদিকে এস।

সৌমিত্র ডাকছে ! আমি প্রায় উড়ে গেলাম সৌমিত্রর কাছে – বল, ডাকছিলে কেন ?

– আমরা এটা হলিডে প্ল্যান করছি। তুমি মতামত দাও।

– সে কী ? মাত্র দশমিনিট ছিলাম না ! এরই মধ্যে. . . ? কোথায় যাচ্ছি ? গোয়া ? দেশের বাইরে ? তাহলে মেক্সিকো চল ।

হো হো হেসে উঠল বাবা । সৌমিত্র অবাক – হঠাৎ মেক্সিকো ?

– ওখানে মেক্সিকান গাইরো খাব । তার্তিয়া ব্রেড. . . টম্যাটো কনকা . . .

– ওরে বাবা, থাম থাম। মা চেঁচিয়ে উঠল।

– তাহলে ইটালি ?

– এই মুহূর্তে কাছাকাছি কোথাও যাওয়ার প্ল্যানে আছি। আপাতত আমরা একটা রাজবাড়িতে যাচ্ছি। দুটোদিন থেকে আসব। রেডি থেক।

– ওহ, সেটা কোথায় ? সোনারপুর ?

– হেসো না। কলকাতার কাছেই। কলকাতা থেকে দুর্গাপুর এক্সপ্রেস ধরে গুড়াপের দিকে যাচ্ছ। বসিরহাট থেকে খানিকটা দূরে একটা মোড় পড়বে। গোকুলধাম মোড়। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির আছে। মোড় থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। হোম স্টে। চার মহলা। সত্তরটা ঘর। যাবে ফুল ? ফুল ! এমনভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল সৌমিত্র ! আপত্তির কথা ভাবতেই পারলাম না। ঠিক হল নেক্সট স্যাটার ডে আমরা যাচ্ছি।

[২]

এই চার মহলা বাড়িটাতে ঢুকে আমি কেমন একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেলাম। লম্বা লম্বা বারান্দা, আর্চ টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। ওখানে একটা চওড়া ধাপের সিঁড়ি আছে। আসলে মনে মনে ছাদে উঠতে চেয়েছি। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে মনে হল আমি এই বিশাল ছাদে হারিয়ে যাব। ছাদের একপাশ থেকে অন্য পাশে ছুটে বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নীচে নেমে দেখি চা-কফির আড়ত খুলে বসেছে মা। বেশ খুশির মেজাজে আছে সব।

দুপুরটা এল ভারি অলস পায়ে। ছত্রি দেওয়া খাটে শুয়ে এপাশ ওপাশ করছি। আমার ভাতঘুমের অভ্যেস নেই। উঠে বসলাম। ঘরের বাইরে চকমিলান বিশাল বারান্দা চলে গেছে ওইদিকে। কেউ কোথাও নেই ! এই নির্জনতায় কেমন এক ধরণের আবিষ্টতা কাজ করে আমার মধ্যে। ঘরের ভেতরের বিশাল আয়না নিঃশব্দে লক্ষ্য করে যাচ্ছে আমাকে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছি ! আয়নার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঘরের ভেতরের আসবাব। কারুকাজ করা খাট, দেরাজ, আরাম কেদারা . . . এখানে আমার জিনস, কুর্তি এক্কেবারে বেমানান। আমার সঙ্গে আছে এথিকাল ঘাঘরা, জমকালো ওড়না . . . ভারী ঝোলানো দুল। প্রাচীন রাজবাড়িতে যাচ্ছি ভেবে এই ড্রেস এনেছি। পরবো ? ঘোর ঘোর লাগছে! নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাবরণ করে ফেললাম। জরির ওড়নায় জড়িয়ে নিলাম আমার ফুলের শরীর। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরের আমি-টা পুরো হারিয়ে গেল। কী আশ্চর্য রূপবতী আমি ! নিজেকে এভাবে দেখিনি তো কখনও ! ফিরোজা কালারের জরির ফুল বসানো ওড়নায় আমার শরীর ফুটে উঠল। এমন করে নিজের প্রেমে পড়িনি কখনও। ক্ষীণ কটি পীণপয়োধরা নারী প্রাচীন কাব্য থেকে উঠে এসেছে। অদ্ভুত রোমাঞ্চে আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছি। আবেশে চোখ বুজে ফেললাম। শ্বাস ঘন হয়ে উঠছে। আয়নায় কারও ছায়া পড়েছে ! জানি ! কে এসেছে জানি। আমি তাঁর উপস্থিতির গন্ধ পাচ্ছি। চোখ বুজে তাঁকে অনুভব করতে পারছি। দমকা হাওয়ার মত দুপুরটা উদ্দাম হয়ে এল এই ঘরে গরম বাতাসের সঙ্গে। আমি ভেসে যাচ্ছি নতুন আবেশে। সৌমিত্র এসেছে ! আমি দেখতে পাচ্ছি যেন হাওয়ায় ভেসে এল ও।

একটা সময় সব শান্ত হয়ে এল। চোখ খুললাম যখন, ঘরে কেউ নেই! আগের মতই দরজা ভেজিয়ে রাখা। ঘরের কোথাও দুপুরের উদ্দামতার চিহ্নটুকু নেই। ঝড় নিভিয়ে, শান্ত করে কোথায় চলে গেছে সৌমিত্র। আমি কি স্বপ্ন দেখেছি ? নিজের মনের ভেতরে ঢুকেছিলাম স্বপ্নে !

জিনস কুর্তি পরে নিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সৌমিত্র এমন একটা রূপকথার দুপুর উপহার দেবে বলেই কি আমাকে এখানে একান্ত নির্জনতায় নিয়ে এসেছে ! সৌমিত্র ভালবাসে আমাকে ? উফ ! কিন্তু একটু জানতে দেয়নি, বুঝতে দেয়নি আমাকে !

পা টিপে টিপে আমি আমার সদ্য পাওয়া প্রেমকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। এত ঘর, মহলের কোথায় লুকিয়ে সে আমাকে দেখছে ! প্রাচীন রাজারা নাকি তাঁদের রানীর সঙ্গে এভাবে লুকোচুরি খেলতেন।

একটা সময় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। কেন লুকিয়ে আছে ও ? কেন ধরা দিচ্ছে না আমার রোমাঞ্চময় শরীর-মনের কাছে ?

সিঁড়ির ধাপে পা রেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কেউ উঠে আসছে ! কে ? সিঁড়ির বাঁক ঘুরে সামনে এল কেয়ারটেকার। এই রাজবাড়ির দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে এই লোকটি। আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসু চোখে থমকাল – কিছু চাই ম্যাডাম ?

– না, আসলে এত বড় বাড়ি, আমি সৌমিত্রকে আই মিন আমার রিলেটিভকে খুঁজে পাচ্ছি না !

– আপনাদের সঙ্গে এসেছেন তো ? উনি লাঞ্চের পরেই তো কাছের একটা বাজার দেখতে বেরিয়েছেন। গাড়ি নিয়েই গেলেন। ঘন্টা দুই হল। চলে আসবেন। আমাদের একটি ছেলে সঙ্গে গেছে। ওই যে গাড়ির আওয়াজ . . . এলেন বুঝি !

আমি দৌড়ে বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে দেখলাম গাড়ি থেকে নামছে সৌমিত্র। সারাদুপুরের ঘোরাঘুরির উড়ো ঝুরো ক্লান্তি লেপটে রয়েছে চেহারায়। আমি অবাক হয়ে গেলাম বললে ভুল হবে। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বারান্দায় ঝুঁকে পড়া আমাকে দেখতে পায়নি সৌমিত্র। বাবার সঙ্গে কথা বলছে – ভাতঘুম না দিয়ে আমার সঙ্গে গেলে পারতেন। চমৎকার

বাগান দেখে এলাম মন্দির থেকে খানিকটা দূরে। শুধু গোলাপ ! বিভিন্ন কালারের ! ফুটে আছে যেন দুধে স্নান করেছে। সব সাদা। গন্ধ নেই তেমন সাদা গোলাপে। ওগুলো শীতের ফুল। বাকি গুলো আহা ! কি সুবাস ! আর বাজারটা আহামরি কিছু নয়।গ্রামের লোকজনের ভিড়।

অজান্তে আমার চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল। সৌমিত্র আজ ছিলই না দুপুরে ! তাহলে আমি কি কল্পনায় ওকে কামনা করেছি ? কল্পনা আমাকে কামনার, ভালবাসার তুঙ্গে তুলেছে ? ইস ! কী ভাববে সৌমিত্র এসব জানতে পারলে ! সৌমিত্র সারাটা দুপুর প্রকৃতির সঙ্গে কাটাল ! আর আমি যে ওর পাশে ছিলাম ওতপ্রোতভাবে, সেটা ও অনুভবও করেনি ! ও আমাকে আজ জীবনের অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাদ দিয়েছে, সেটা ও জানলই না ? আশ্চর্য !

ভালবাসা নাকি একতরফা হয়না। হয় হয় ! এই ঘোর কাটানোর পথ আমার জানা নেই। এবার কালী তোমায় খাব বা পচা সিঙ্গারার সাধ্য নেই এই ঘোর থেকে আমাকে উদ্ধার করে !

কুর্তির ওপরে জরির ওড়না জড়িয়ে নিলাম। সৌমিত্রর কাছে পৌঁছতে হবে। দেখি ওর সব মনে পড়ে কিনা ! নাকি সবই শীতের গোলাপ ! যার গন্ধ নেই ! সব রঙ লুকিয়ে সাদা হয়ে আছে ! সেটাও জানা দরকার !

সৌমিত্র উঠে আসছে। আমি নামছি। দেখা হবেই একটা বিন্দুতে এসে।

---

**সাগরিকা রায়** – ডুয়ার্সে জন্ম। সাহিত্যের ছাত্রী। লেখালেখির শুরু কলেজ জীবন থেকে বিভিন্ন চড়ুই পত্রিকায়। কিছুদিন শিক্ষকতার পর পুরোপুরি সাহিত্যে মনোনিবেশ। উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বসুমতী, দৈনিক বর্তমান, সাপ্তাহিক বর্তমান, দেশ, সানন্দা, আনন্দমেলা, উনিশ কুড়ি, অনুষ্টুপ, শিলাদিত্য, কিশোর ভারতী, নবকল্লোল ফেমিনা, গৃহশোভা, যুগশঙ্খ, আজকের সম্পূর্ণা ছাড়াও অন্যান্য অনেক ছোটগল্প ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত ছমছমে ১৭টি গল্প নিয়ে মৃত্যু উপত্যকা নামের গল্প সঙ্কলন, ডার্ক ফ্যান্টাসি-গল্প প্যান্ডোরার বাক্স, মরা মৌমাছির চোখ নামে রহস্য উপন্যাস, স্ব-নির্বাচিত নামে একটি ছোট গল্প সঙ্কলন, হিম পড়ছিল [থ্রিলার], ধূসর জগত [হরর গল্প ১৩টি], ডুয়ার্সের গপ্পোসপ্পো [ডুয়ার্স নিয়ে ছোট ছোট গল্প], শালবনে রক্তের দাগ [থ্রিলার] ছাড়াও প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে ২০টি ছোট গল্পের সঙ্কলন, রহস্য নভেলা, এবং আরও কিছু বই। এছাড়া রয়েছে প্রচুর গল্প বিভিন্ন গল্প সঙ্কলনে। ২০১৫-য় উত্তরবঙ্গের কোচবিহার থেকে ত্রিবৃত্ত সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত। ২০১৭-য় কুসুমের ফেরা পত্রিকা থেকে নবরত্ন পুরস্কার প্রাপ্তি।

## ইন্দ্রাণী দত্ত

# পরীছাঁট

রবিবারের বিকেলে শপিং মলের এস্ক্যালেটরের সামনে দাঁড়িয়ে অ্যান হ্যাথওয়েকে মনে করার কথাই নয় অদিতির। অ্যান হ্যাথওয়ের সিনেমা সে খুব কমই দেখেছে – দুই মেয়ের সঙ্গে প্রিন্সেস ডায়ারি আর হিমানীশের সঙ্গে ডেভিল ওয়ারস প্রাডা দেখেছিল। আর কি একটা সিনেমা দেখতে গিয়ে সং ওয়ানের একটা ট্রেলার – অথচ এই রবিবারের বিকেলে এস্ক্যালেটর থেকে নেমে ঐ ট্রেলারটাই মনে এল অদিতির। এই শপিং মলের উপচে ভরা ভীড়, আলোকোজ্জ্বল বিপণি, এস্ক্যালেটর, স্যান্টা ক্লজ, শেষ বিকেলের রোদ্দুরটুকু, গোটা মল জুড়ে ক্রিসমাসের সাজ-সব ছাপিয়ে সং ওয়ানের অ্যান হ্যাথওয়ের মুখ ওর একটা সুপ্ত ইচ্ছে জাগিয়ে তুলল। আসলে অদিতি নিজের জন্য সময় দেয়নি কোনদিন; জামা কাপড়, জুতো, নিজের লুক-কোনো কিছু নিয়েই সেভাবে ভাবে নি। শপিং মলে যতবারই এসেছে-মেয়েদের নিয়ে, হিমানীশের সঙ্গে বা কখনও বন্ধুদের সঙ্গে-প্রতিবারই কী কিনবে, কী করবে, কোথায় খাবে আগেই ঠিক করে এসেছে – তারপর কেনাকাটা ক'রে, সিনেমা দেখে, খেয়ে দেয়ে ফিরে গেছে। আজ পুরো এক ঘন্টা শুধুই নিজের জন্য হাতে পেয়ে খানিক অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রথমটায়, তারপর ঈষৎ দিশেহারা। একটা খেলনা ভর্তি ঘরে ছোটো বাচ্চাকে ঢুকিয়ে দিলে যা হয়-অদিতির ঠিক সেইরকম লাগছিল-যেহেতু কি করবে আগে থেকে ঠিক নেই, চাপা উত্তেজনা হচ্ছিল, কিছু একটা করা দরকার এরকম মনে হচ্ছিল অথচ ঠিক কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। আবার এই উত্তেজনাটুকু যে ওর মধ্যে বেঁচে আছে সেটা বুঝতে পেরেও শিরশির করে আনন্দ হচ্ছিল। অজস্র দোকান ওকে ঘিরে, বিবিধ পসরা-অদিতি একের পর এক দোকানে ঢুকছিল, মাথা নেড়ে বেরিয়ে আসছিল আবার পরের দোকানে ঢুকছিল। বই কিনবে না কি কুর্তি না একটা টি সেট – সে নিয়ে ধন্ধে পড়ছিল। আবার এই ধন্ধে পড়াটাও উপভোগ করছিল খুব। অথচ ঘটনা খুবই সাধারণ। অদিতিরা দুপুরে মলে এসেছিল – এক বৈদ্যুতিন সামগ্রীর দোকানে। লোক উপছে পড়ছিল শপিং মলে-ক্রিসমাস সামনেই। অদিতির বরের ল্যাপটপের গন্ডগোল, লজিক বোর্ড বদলাবে না নতুন মডেল কিনবে সেই নিয়ে কথা বলছিল দোকানে, বিবিধ ল্যাপটপের মডেলের বৈশিষ্ট্য শুনছিল মন দিয়ে, নিজের মতামত দিচ্ছিল, মাথা নাড়ছিল; দুই মেয়ে ডিসপ্লে করা ট্যাব, ফোন, ল্যাপটপ ছুঁয়ে ছেনে খেলে বেড়াচ্ছিল। অদিতি প্রথমে ভিতরেই ছিল। হঠাৎই মনে হয়েছিল-বড্ড ভীড়। দোকান থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে বসেছিল। অদিতির বসার জায়গা আর দোকানের মাঝখান দিয়ে জনস্রোত বয়ে যাচ্ছিল। নিজের স্বামী কন্যাদের দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিল অদিতি। কখনও হিমানীশের চেক শার্টের কাঁধের অংশ দেখছে, কখনও দুই মেয়ের ফ্রকের কোণা, বা টী শার্ট অথবা হেয়ার ব্যান্ড। একটু দূরের লাগছিল তিনজনকেই। যেন এক নদী পেরিয়ে চলে এসেছে অদিতি, অন্যপাড়ে হিমানীশ আর মেয়েরা। উঠে দাঁড়িয়েছিল অদিতি তারপর রেলিং-এ ভর দিয়ে দেখছিল এস্ক্যালেটরের নামা ওঠা, দেখছিল ক্রিসমাস ট্রী, আলোকমালা, বিশাল বেথেলহেম স্টার, দেখছিল অজস্র মানুষের স্রোত, কেনা কাটা – এক দল অল্পবয়সী মেয়ে হৈ হৈ করে ঢুকল বিউটি পার্লারে, বাবা মা আর ছেলে ঢুকল জুতোর দোকানে, পাশের দোকান থেকেই বেরিয়ে এলো তরুণ দম্পতি, তিনটি মেয়ে আইসক্রীম খেতে খেতে সেল্ফি তুলল।

কোনোদিন একলা কিছু করে নি অদিতি, একলা সিনেমা দেখে নি, একলা আইসক্রীম খায় নি, একলা ট্রেনে চড়ে যায় নি কোনখানে – এই সব হঠাৎ অদিতির মনে হতে লাগল। এই জনস্রোতের কতজন আজ অদিতির মত নদীর অন্য পাড়ে চলে এসেছে হঠাৎ – জানার ইচ্ছে হচ্ছিল। দুটো তিনটে চারটে ভাষায় কথোপকথন কানে আসছিল। কফি, পারফিউম আর ফুলের গন্ধ পাচ্ছিল অদিতি। ভালো লাগছিল। ও টেক্সট করল হিমানীশকে – 'দেরী হবে?'

– 'আরো ঘন্টাখানেক লেগে যেতে পারে, তুমি শাড়ি টাড়ি দেখো ততক্ষণ। না কি ? আমাদের কাজ হয়ে গেলে ফোন করব।'

অদিতি এস্ক্যালেটর বেয়ে নিচের তলায় এলো। সামনেই বিউটি পার্লার, জামা কাপড়, জুতোর দোকান, স্যালন। আর একটু এগিয়ে বইএর দোকান, কফি শপ, খেলনাপত্র। আরো একটু এগিয়ে এস্ক্যালেটর উঠে গেছে সিনেমা হল অবধি। দুটো কুর্তি নিজের ওপর ফেলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, ডিসপ্লে করা নানা রকম জুতো দেখল খানিক তারপর স্যালনের সামনে এল। স্যালনের বাইরে নানা ছাঁটের নানা রঙের চুলের মেয়েদের ছবি, অদিতি কাচ দরজা দিয়ে দেখল-ভেতরে দেওয়াল জোড়া আয়নার সামনে হেলানো সিটে বসা নানা বয়সের মহিলা; কালো জামা কালো প্যান্ট পরা হেয়ার ড্রেসাররা শ্যাম্পু করছে, চুল কাটছে। হেয়ার ড্রেসারদের মাথায় ক্রিসমাস হ্যাট। ঠিক তখনই অ্যান হ্যাথওয়ের মুখ ভেসে এল। আসলে দীর্ঘদিনের একটা ইচ্ছে মাথা তুলল হঠাৎ। অদিতি চিরকালই নরম সরম। মুখের ওপর কথা তো দূরে থাক, না বলতে পারেনি কাউকে আজ অবধি। চিরকালই ভীড়ে মিশে থেকেছে খানিকটা অদৃশ্য হয়ে। অথচ মনে মনে খুব ধারালো একটা ব্যক্তিত্ব পেতে চেয়েছে চিরকাল – অল্পবয়সে, সুচিত্রা মিত্র আর কমলিকা ভট্টাচার্য ওর পছন্দের ব্যক্তিত্বের তালিকায় প্রথমদিকে ছিল। আবছা মনে হ'ত ওর চুল ঐ রকম হ'লে ও হয়ত বদলে যাবে। প্রখর উজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব হয়ে যাবে অদিতিও। এসব যে অদিতি খুব বিশ্বাস করত তা নয়, ঐ রকম চুল কাটার একটা আলতো আকাঙ্খা তুলোর আঁশের মত বসে থাকত ওর ভাবনার ওপরে। চুল কাটার ইচ্ছে বাড়িতে জানালে, অদিতির মা'র সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ছিল – 'ঐ সব স্টাইল বিয়ের পরে কোরো। এখন পড়াশোনা শুধু।' অদিতি যেমন – মুখ তুলে তর্ক করেনি একবারও। তারপর ভুলেই গিয়েছিল। বস্তুত পড়াশোনা, পরীক্ষা, স্কুলের চাকরি, সংসার সব নিয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে চুল কাটার কথা আর মনে হয়নি কোনদিন। ঘন লম্বা চুল, বিণুনী, খোঁপা – এসব নিয়ে তার স্বামীর, বন্ধুদের এবং একেবারেই অপরিচিত জনের মুগ্ধতা সে দেখেছিল। সেটাও ভুলে যাওয়ার একটা কারণ সম্ভবতঃ। আজ অ্যান হ্যাথওয়েকে মনে পড়ে গেল আর তুলোর আঁশটা এত দিন পরে উড়ে এসে আবার ওর গায়ে বসল। পেটের ভিতরে প্রজাপতি টের পেল অদিতি, বুকে একটু সংকোচ আর এক ছটাক দ্বিধা; পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইচ্ছেটা এমন জোরালো হয়ে উঠল যে কাচ দরজা ঠেলে সটান স্যালনে ঢুকে পড়ল সে।

অদিতি শেষ চুল কেটেছিল ক্লাস ফোরে। বস্তুত নেড়া হতে হয়েছিল – স্কুলের বেস্ট ফ্রেন্ড শম্পার থেকে উকুন এসেছিল মাথায়। বাড়িতেই চুল কাটা হয়েছিল। স্বপনদা বাড়িতেই ক্ষুর কাঁচি নিয়ে এসেছিল; অদিতি বসেছিল একটা মোড়ায়, বাড়ির উঠোনে। মা আর ঠাকুমা পাশে ছিল। একটা সাদা চাদর ওর গায়ে জড়িয়ে প্রথমে কাঁচি দিয়ে চুল কেটেছিল স্বপনদা। তারপর ক্ষুর দিয়ে চেঁছেছিল।

এই স্যালনের নাম জাস্ট কাট-ওয়াক ইন স্যালন – লেখা ছিল কোথাও। কাউন্টারে গিয়ে নাম লেখালো অদিতি। চশমা পরা হাসিখুশি একটি মেয়ে এলো অদিতির চুল কাটতে।

– 'শ্যাম্পু করাবেন? ব্লো ড্রাইং?'

– 'অত কিছুর তো সময় নেই আজ, শুধু চুল কাটব।'

– 'কতটুকু কাটবেন? জাস্ট ট্রিমিং তো?'

– 'না পিকসি কাট'।

– 'আর ইউ সিওর? ওন্ট ইট বী আ বিট টু এক্সট্রীম?'

– 'না না আমি সিওর।'

– 'বব করে দি বরং। মানাবে আপনাকে।'

– 'না পিক্সি কাটই। আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর।'

– 'আপনার ফেমিনিন লুকটা কিন্তু চলে যাবে'

– 'আপনি কাটুন তো। আচ্ছা, কতক্ষণ লাগবে ?'

মেয়েটি অদিতির বিণুণী খুলে, কাঁচি চালায়। কাঁচির চলন ওর পিঠ বেয়ে কাঁধে, তারপর ঘাড়ে ওঠে, হেয়ারলাইন স্পর্শ করে। অদিতি সামান্য শিউরে চোখ বুজে থাকে।

– 'নাউ উই আর গোইং অ্যারাউন্ড ইওর ইয়ার'

ঘাড়ের কাছে হাল্কা লাগে। কানের পাশ থেকে, কপালের ওপর থেকে চুলের গুচ্ছ পায়ের ওপর ঝরে পড়ছে টের পায় সে।

– 'দেখে নিন এবারে, হয়ে গেছে।'

চোখ খুলে চমকে গেল অদিতি-আয়নায় অল্পবয়সের সুচিত্রা মিত্র। খুব ধারালো আর ঝকঝকে – একেবারে অন্য এক অদিতি। নতুন।

– 'ও মাই গড ! হোয়াট আ জ লাইন ইউ হ্যাভ গট। লুক অ্যাট ইওর চীকবোন, বিউটিফুল ! এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলেন এই ভাবে?'

অদিতি হাসে।

মেয়েটি চশমায় আঙুল ঠেকিয়ে অদিতিকে আবার দেখে তারপর বলে – 'আই গেভ ইউ আ নিউ উওম্যান, কমপ্লিটলি নিউ উওম্যান। টেক গুড কেয়ার অফ হার। মেরি ক্রিসমাস।'

নতুন অদিতি স্যালনের বাইরে এসে ক্রিসমাস ট্রীর সামনে দাঁড়িয়ে সেল্ফি তোলে। তারপর এস্ক্যালেটরে ওঠে। খুব হালকা লাগতে থাকে। কাচ দেওয়ালে নিজেকে দেখে আর চোয়ালে, গালে আঙুল বুলোয় আলতো করে।

হিমানীশ আর মেয়েরা তখনও দোকানেই। 'আর কতক্ষণ ?' টেক্সট করে অদিতি।

হই হই ক'রে বেরিয়ে আসে হিমানীশ, দুই মেয়ে – হাতে প্যাকেট।

– 'দ্যাখো কত কি কিনেছি। এমা, একী করেছ মা ?'

– 'ইশ কি করেছ চুলে? একদম ছেলেদের মত লাগছে তোমাকে – অদিতি তুমি না – উফ –'

– 'এইটুকু সময়ের মধ্যে ডিসিশন নিয়ে নিলে ? বললেও না আমাদের!'

– 'তোমার চেহারায় মানায় না কি এই সব '?

– 'এইভাবে চুল কাটলে বয়স কমে যাবে ভেবেছে তোদের মা!'

– 'একদম মা মা লাগছে না তোমাকে –'

– 'কী যে কর তুমি! এক ঘন্টাও হয় নি-এর মধ্যে কি সব করে এলে!'

– 'পুরো দিনটা ঘেঁটে দিল-দ্যুৎ!'

এই মুহূর্তে নতুন আর পুরোনো অদিতিকে ঘিরে আলোজ্বলা দোকানপাট, মানুষের নদী, স্যান্টা ক্লজ, বেথেলহেমের তারা –

নতুন অদিতি বলল – 'আমার চুল, আমার ইচ্ছে, আমার টাকা, আমার সময়।' পুরোনো অদিতি তার গলা টিপে থামিয়ে দিল; চোখ নামিয়ে নরম গলায় বলল, 'নাক কান নয়, চুলই তো, আর কাটব না। আবার আগের মত হয়ে যাবে, দেখো। রাগ কোরো না, প্লীজ, রাগ কোরো না।'

একটা ম্যাজিক হওয়ার কথা এইখানে – এত ভীড়ে কিচ্ছু শোনা গেল না।

---

**ইন্দ্রাণী দত্ত** – সিডনির বাসিন্দা পেশায় বিজ্ঞানী কিন্তু গল্প লেখার তীব্র আকুতি টের পান। শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, ''আমরা যখন সত্যিকারের সংযোগ চাই, আমরা যখন কথা বলি, আমরা ঠিক এমনই কিছু শব্দ খুঁজে নিতে চাই, এমনই কিছু কথা, যা অন্ধের স্পর্শের মতো একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয়। পারি না হয়তো, কিন্তু খুঁজতে তবু হয়, সবসময়েই খুঁজে যেতে হয় শব্দের সেই অভ্যন্তরীণ স্পর্শ।'' ইন্দ্রাণী খুঁজে চলেছেন।

# মৈনাক চৌধুরী

## পৈতৃক

(১)

''পূর্ব-পশ্চিম''-এর প্রথম কয়েক পাতা সবে পড়া হয়েছে, এমন সময়ে সার্থকের বিদঘুটে ''ভূতের রাজা'' রিংটোনটা বেজে উঠল । মায়ের নাম্বার । এত রাতে মা সাধারণত ফোন করে না । কিছু বিপদ আপদ হল না তো ? একটু উৎকণ্ঠা নিয়ে ফোনটা তোলে সার্থক ।

''বাবু, ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি ?'' সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করে দীপা ।

''না না বলো, কি হয়েছে ?''

''বলছি যে, কালকের দিনটা মনে আছে তো ? বাবার ফটোটায় মনে করে মালা দিস আর বাবাকে একটু স্মরণ করিস'' — উপরোধের আভাস দীপার গলায় ।

সত্যি কথা বলতে সার্থকের মনে ছিল না দিনটার কথা । থাকবেই বা কি করে ? আজ থেকে প্রায় উনিশটা গ্রীষ্ম আগে, যখন সার্থকের মাত্র এগারো মাস বয়স, কোনও এক তাপদগ্ধ জৈষ্ঠ্যের দীর্ঘ দুপুরে তার নাতিদীর্ঘ জীবনের যবনিকাপাত করে চলে গিয়েছিল অমিত, অর্থাৎ সার্থকের বাবা । বাবার সাথে তাই তার প্রতিকৃতিতেই পরিচয় । সেই অগভীর আলাপচারিতার রেশ যে স্মৃতির অন্তস্তলে প্রবেশ করে, বাবার জন্ম মৃত্যু বিয়ের দিন তিথি তাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্মরণ করাবে না, তা বলাই বাহুল্য ।

তবে মনে ছিল না একথা মাকে বলা যাবে না, মা অকারণে মনে কষ্ট পাবেন । তাই কিছুটা কৃত্রিম সুরে সার্থক বলল ''মনে আছে । তুমি আবার এতো রাতে কষ্ট করে ফোন করতে গেলে কেন ? শুয়ে পড় । আমি কাল সকালে রজনীগন্ধার বড় মালা নিয়ে আসব ।''

সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের শেষে আবার সুনীল- সাহিত্যে মজে সার্থক ।

(২)

সার্থকের বাবা অমিতরা ছিল তিন ভাই । অমিত সর্বকনিষ্ঠ । অমিতের মৃত্যুর আগে অবধি তাদের পৈতৃক ভিটেতে তারা সবাই একরকম শান্তিপূর্ণ ভাবেই ছিল । সুখী একান্নবর্তী পরিবারের মত । তাল কাটে অমিতের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর । দীপা সার্থক কে নিয়ে পাকাপাকিভাবে বাপের বাড়ি চলে যায়, কোনও সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই ।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দীপা দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয় । অমিতের বাড়ির লোকেদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবার যেন আগ্নেয়গিরির চেহারা নেয় । দীপা তার ফেলে যাওয়া কিছু জিনিসপত্র শ্বশুর বাড়িতে নিতে এলে তীব্র বাদানুবাদ হয় উভয়পক্ষের মধ্যে । অমিতের মেজোদাদা পরিতোষ দীপাকে সরাসরি তার মাতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে । এ কথা বলতেও ছাড়ে না যে দীপার জিম্মায় থাকলে ছেলে উচ্ছন্নে যাবে । পরিতোষ প্রস্তাব দেয় সার্থক কে তার কাছে রেখে যেতে । বলা বাহুল্য দীপা সে প্রস্তাবে রাজি হয় না । সে ছেলেকে তার মায়ের হেপাজতে রেখে, নতুন সংসার আরম্ভ করে । প্রাক্তন শ্বশুর বাড়ির সাথে সম্পর্ক একরকম প্রায় বিচ্ছিন্নই হয়ে যায় ।

(৩)

সার্থক বড় হতে থাকে দিদিমার কাছে। বাবা-মরা ছেলেকে ভালোবাসা যায় কিন্তু শাসন করতে বড় কষ্ট হয়। তাই পাঠ্য-পুস্তক বৈরাগী নাতিকে বাগে আনতে পারে না দিদা। তথাকথিত লেখাপড়ায় আগ্রহ না থাকলেও গল্পের বই পড়তে পারলে আর কিছু চায় না সার্থক। ক্লাস এইট-এ উঠতেই পাড়ার বাণীসদন লাইব্রেরির কনিষ্ঠতম সদস্য হয়ে যায় সে। গোগ্রাসে গিলতে থাকে একের পর এক কিশোরসাহিত্য। কিন্তু খালি বাংলা গল্পের বই পড়ে তো আর মাধ্যমিকের বৈতরণী পার হওয়া যায় না। ফল যা হওয়ার তাই হয়। ইংরেজি আর অঙ্কে দুঅঙ্কের ঘরেও নম্বর পৌঁছায় না।

গতানুগতিক পড়াশোনার সাথে তার তিক্ততা ক্রমশ গাঢ় হতে থাকে। সখ্য বাড়তে থাকে মানিক, তারাশঙ্কর, শরদিন্দু, বিভূতিভূষণ, সুনীল, শক্তিদের সাথে। দুবারের প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক ও উচ্চ্যমাধ্যমিক কোনোরকমে উত্তীর্ণ হলেও তার বেশি এগোনো সম্ভব হয় না। এরইমধ্যে তার নবতিপর দিদিমা হঠাৎ একদিন স্ট্রোক হয়ে কোমায় চলে যায়। পনেরোদিন যমে মানুষে টানাটানির পর পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় সার্থকের সবথেকে কাছের মানুষটি। সারা জীবন মায়ের স্নেহ মায়া ভালোবাসা সে দিদিমার কাছ থেকেই পেয়েছে। তাই নিজেকে এবার তার প্রকৃত অর্থেই অনাথ মনে হয়।

(৪)

দীপা ছেলেকে কিছুদিন নিজের কাছে এনে রাখলেও সদ্য আঠেরোর পা দেওয়া ছেলের বদমেজাজ আর খামখেয়ালিপনা সে সামলাতে পারে না। অগত্যা ফ্যাসাদে পড়ে মেজোভাসুর পরিতোষের সাথে যোগাযোগ করে সে। সুযোগ বুঝে দীপাকে খোঁচা দিতে ভোলে না পরিতোষ। সে বলে তার কাছে ছোটবেলায় দিয়ে দিলে আজ এই পরিণতি দীপাকে দেখতে হত না।

পরিতোষ ঠিক করে পড়াশোনার পেছনে আর বৃথা সময়, অর্থব্যয় না করে সার্থককে অভিনয় শেখার কোনও ভাল কোর্স-এ ভর্তি করে দেবে। অভিনয় তাদের রক্তে। পরিতোষ, অমিত দের বাবা জানকীনাথ খুব বড় থিয়েটার অভিনেতা ছিলেন। তারা তিন ভাই — ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাট্যদলে প্রচুর যাত্রা পালা করেছেন। পরিতোষ কয়েকটা টিভি সিরিয়াল এ ছোটখাটো রোলও করেছে। তবে তা নিতান্ত শখেই। ই-এস-আই কর্পোরেশনের সরকারি চাকরি ছেড়ে পাকাপাকিভাবে অভিনয়কে পেশা হিসেবে ইচ্ছে আর সাহস কোনওটাই ছিল না তার।

সার্থকেরও অভিনয়ের দিকে বেশ ঝোঁক। সে দেখতেও সুদর্শন। স্কুলের নাটকে প্রতিবারই লিড রোল পায় সে। চারদিকে এখন এতো চ্যানেল-এর রমরমা। অ্যাকটিং টা ঠিকঠাক শিখতে পারলে কিছু কাজ জুটলেও হয়ত জুটে যেতে পারে।

(৫)

ফুলের দোকানে বড় মালা পায়না সার্থক। তাই মাঝারি মাপের রজনীগন্ধর মালা নিয়ে আসে। বাবার ফটোতে মাল্যদান করে মেজোমা অর্থাৎ পরিতোষের স্ত্রী মঞ্জুর হাতে বানানো লুচি তরকারি দিয়ে প্রাতঃরাশ সারে সে। তারপর নিজের লেখার খাতাটা বের করে কল্পনার জগতে ডুব দেয়। ঘোর কাটে দীপার অতর্কিত ফোনে।

''বাবু, কি করছিস ?'' অভ্যাসমত জিজ্ঞেস করে দীপা।

কল্পনার রঙিন চরিত্রের ছেড়ে মায়ের সাথে গতানুগতিক শুষ্ক কথোপকথনে স্বভাবতই সে এখন আগ্রহী নয়। তাই বিরক্তি এবং অধৈর্য্যের সুরে বলে ''একটা গল্প লিখছি, কি হয়েছে তাড়াতাড়ি বল।''

''গল্প ? হঠাৎ ?''

''হঠাৎ কেন ? অনেকদিন ধরেই লিখি। তুমি জান না।'' — বেশ রুক্ষ স্বরে বলে সার্থক। মায়ের প্রতি জমাট বাধা অভিমান আর রাগ এভাবেই মাঝে মধ্যে উগরে দেয় সে। তবে এবার তার নিজেরই একটু খারাপ লাগে। মার তো জানার

কথাই নয় যে সে গল্প লেখে। কারণ সে এই লেখালেখির কাজ যথাসম্ভব লোকচক্ষুর অন্তরালেই করে। তাই স্বর পরিমার্জন করে বলে ''আসলে এটা লিখছি একটা ম্যাগাজিনের জন্য। ওরা একটা ছোট গল্পের প্রতিযোগিতা করছে। সব থেকে ভালো তিনজনের লেখা ওদের পূজাবার্ষিকী সংখ্যায় ছাপা হবে।''

''ও আচ্ছা, ঠিকাছে ভালো করে লেখ। পরে শুনব ক্ষণ গল্পটা। বলছি মালাটা এনেছিলি ?''

''হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা সকালেই দিয়ে দিয়েছি।''

''বাঃ বেশ !! আচ্ছা শোন, ও বাড়িতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো তোর ?''

''না খুব ভালো আছি এখানে। মেজোমা অনেক কিছু ভালোমন্দ করে খাওয়াচ্ছে।''

''তোর আশেপাশে এখন কেউ আছে ?''

''না, কেন বল তো ?''

''দোতলায় তোর বাবার ঘরটায় একটু যাস তো সময় পেলে ! ওটা বোধহয় এখনও তালাবন্ধই আছে।''

''সে না হয় যাব কিন্তু এটা বলার জন্য এত গোপনীয়তার কেন ?''

''একবার দেখিস ওখানে তোর বাবার সব জিনিসপত্র ঠিকঠাক আছে না সেগুলো সব বিক্রিবাটা হয়ে গেছে ?''

''আচ্ছা তোমার এরকম কেন মনে হয় মা ? বাবা তো জ্যাঠার নিজের ভাই। কেউ নিজের ভাইয়ের স্মৃতি বিক্রি করে দেয় ?''

''ওরে তুই শিশু, তোর কোনও ধারণা নেই, ওরা সব পারে। আচ্ছা শোন্ সময় পেলে তোর জ্যাঠাকে একটু কায়দা করে জিজ্ঞেস করিস তো ঐ বাড়িতে তোর বাবার যে ভাগ আছে সেটা তোকে দেওয়ার ব্যাপারে ওরা কি ভাবছে।''

এবার সার্থকের মেজাজটা সত্যিই বিগড়ে যায়। গলায় কিছুটা ঝাঁঝ এনে সে বলে ''মা আমি এখানে বিশেষ কাজে এসেছি। এখান থেকে টালিগঞ্জ এর ফিল্ম ইনস্টিটিউট-এ যাতায়াত অনেক সুবিধে বলে আমি এখানে থেকে অ্যাকটিং এর কোর্সটা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর এখানে কিছুদিন থাকলে থিয়েটার এর জগতে জ্যাঠার চেনাজানা লোকজনের সাথেও কিছুটা পরিচিত হওয়া যাবে। এসবের বাইরে আর অন্য কোনও ফালতু ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে পারব না এখন।''

দীপাও সুর চড়ায় — ''এটা ফালতু ব্যাপার বলছিস ? ঐ বাড়ির এখন মার্কেট ভ্যালু জানিস তুই ? কম করে হলে নব্বই লাখ। তার তিন ভাগের এক ভাগ তো তোরই পাওয়ার কথা। তুই সেটা দাবি করবি না ?''।

রণে ভঙ্গ দেয় সার্থক — ''মা আমি ফোনটা রাখছি। আমাকে গল্পটা আজকের মধ্যে শেষ করতে হবে। এসব নিয়ে বলার হলে তুমি এসে বোলো।''

দীপার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই ফোনটা কেটে দেয় সে।

বিষয় আশয় বিষের মতোই লাগে সার্থকের। এসবের থেকে সে দূরেই থাকতে চায়। তবে বাবার ঘরটা একবার ঘুরে আসা যেতেই পারে। বাবার কি কি জিনিস অক্ষুন্ন আছে সেটা পরখ করতে নয়, বরং বাবার ফেলে যাওয়া অতীতে কিছুক্ষণ বিচরণ করতে। এই বাড়িতে ছোটবেলা থেকে অনেকবার এলেও, এই তালাবন্ধ ঘরটা কোনোবারই ভালোভাবে দেখা হয় না। সে ঠিক করে গল্প লেখা শেষ করে মেজোমার কাছে ঘরের চাবিটা চাইবে।

(৬)

রানীকুঠিতে জ্যাঠার বাড়িতে সার্থক এর তিন মাস থাকার কথা ছিল টালিগঞ্জ-এ অ্যাকটিং কোর্স টা করার জন্য। তিন সপ্তাহের মাথাতেই হঠাৎ করে ফিরে আসে সে। দীপা প্রমাদ গোনে। নির্ঘাত কিছু ঝামেলা পাকিয়েছে ওখানে। এই ছেলেকে নিয়ে তার যেন একটুও স্বস্তি নেই।

সার্থকের হাতে তিনটে বড় বড় ব্যাগ। সে তো মাত্র একটা ব্যাগ নিয়ে গিয়েছিল যাওয়ার সময়। বাকি দুটো ব্যাগ কোথা থেকে এল ? নানা প্রশ্ন উঁকি মারে দীপার মনে। একটু ভয়ে ভয়ে সে জিজ্ঞেস করে — ''কিরে চলে এলি ?''

''হ্যাঁ, অ্যাকটিং ক্লাস ভালো লাগছে না।''

''তার মানে ? এতো টাকা দিয়ে ভর্তি করা হল ? কোর্স কমপ্লিট না করেই চলে এলি ?'' . . . দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে দীপার মগজ।

কোনও কথা না বাড়িয়ে বাথরুম এ ফ্রেশ হতে যায় সার্থক।

দীপা একনাগাড়ে বলে চলে ''লেখাপড়া করবি না। অন্য কিছুও করবি না ? আমার ঘাড়ের ওপর বসে খাবি আর আমাকে জ্বালাবি সারা জীবন ? তাও যদি ও বাড়ি থেকে বাবার ভাগটা আদায় করতে পারতিস।''

সার্থক এবারও কোনও উত্তর দেয় না। বাথরুম থেকে এসে নিজের ঘরে ব্যাগগুলো নিয়ে গিয়ে রাখে। দীপা অবিশ্রান্ত বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে থাকে সার্থককে।

(৭)

আশ্বিনের অলস দুপুরে মধ্যাহ্নভোজন সেরে খাটে উঠে টেবিল থেকে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা আলগোছে টেনে নেয় দীপা। এই তিন চার মাসে সার্থকের খুব একটা উন্নতি লক্ষ্য করেনি সে। সারাদিন বাংলা গল্পের বইয়ে মুখ গুঁজে বসে থাকে, খাতায় কি সব হিজিবিজি লেখালেখি করে আর সন্ধ্যে হতেই বেরিয়ে যায় ক্লাব এ তাস ক্যারাম পেটাতে। তার এ পক্ষের স্বামী শৈবালের পরামর্শে বেশ কিছু কাউন্সেলিং করানো হয়েছে সার্থককে। যদিও তাতে বিশেষ কোনও লাভ হয়নি। ছেলেরা ভালো ভবিষ্যতের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছে সে। পৈতৃক সম্পত্তির ভাগটাও যদি অন্তত পাওয়া যেত ঐ টাকা ব্যাঙ্ক এ রেখে তার অন্তত খাওয়া পড়ার অভাব থাকত না। ছোটখাট কিছু ব্যবসাও করতে পারত। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে পত্রিকার পাতা ওল্টাতে থাকে সে। তিরিশ নম্বর পৃষ্ঠার ''শৈশব'' গল্পটায় এসে চোখটা আটকে যায় দীপার। লেখকের নামটা যে বড্ড চেনা। কিছুটা পড়ে আর এগোতে পারে না সে। গলার কাছটা দলা পেকে আসে।

দীপা নিঃশব্দে পাশের ঘরে যায়। সার্থক নেই ঘরে। বন্ধুদের সাথে বেরিয়েছে খেলতে। তার ব্যাগ খুলে তার হাতে লেখা খসড়া গুলো ঘাঁটতে থাকে দীপা। এই প্রথম ছেলেকে সে বোঝার চেষ্টা করে তার লেখার মধ্যে দিয়ে। সেই দুটো ব্যাগ যেটা জ্যাঠার বাড়ি থেকে এনেছিল এখনও বন্ধই পড়ে আছে। ব্যাগ দুটো খোলে দীপা। দুটো ব্যাগে ভর্তি খালি বই আর খাতা, বেশিরভাগই পোকায় কাটা। সব নামি দামি সাহিত্যিকদের বই। কোনটা সুনীল গাঙ্গুলি, কোনটা শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কোনটা শঙ্খ ঘোষ। সব বই গুলোর একদম প্রথম পৃষ্টায় অমিতের নাম। যেমন ''স্নেহের অমিত কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।'' তারপর ডেট দেওয়া। এগুলো বোধহয় বইমেলা থেকে সংগ্রহ করা অমিতের। খাতা গুলোর লেখা অজস্র ছোট গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ। স্মৃতির সরণি বেয়ে দুই দশক পিছিয়ে যায় দীপা।

অমিতের কবিতা শুনেই অমিতকে প্রথম ভালো লেগেছিল দীপার। হঠাৎ করে ঝোঁকের মাথায় বিয়েও করে ফেলে তারা। বিয়ের পর পরই সার্থক চলে আসে পেটে অথচ অমিতের তখনও সেরকম কোনও উপার্জন নেই। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের দাম্পত্য বিষাক্ত হয়ে ওঠে। কবিতা, লেখালেখি দিয়ে তো আর সংসার চলে না। সেই দিনও রোজকার মত তারা

ঝগড়া করেছিল। তারপর অমিত হঠাৎ করে চুপ হয়ে গেল। দীপার বিষাক্ত বাক্যবাণ-এর আর কোনও প্রত্যুত্তর এল না। খালি এগারোমাসের ছেলেটাকে মন দিয়ে কিছুক্ষণ খুব আদর করল। তারপর নিঃশব্দে ঢুকে গেল নিজের ঘরে। বেরোলো তার নিথর শরীর।

(৮)

সার্থক ও বাড়ি থেকে পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি আনতে না পারলেও তাঁর বাবার ভালোবাসাগুলোকে অন্তত নিয়ে আসতে পেরেছে ব্যাগ-এ ভরে-এ কথা ভেবে ভালো লাগে দীপার। আর অমিতের সৃষ্টি সত্তার একমাত্র উত্তরাধিকারী শুধু যে সার্থকই — অমিতের আরেক অনুপম সৃষ্টি। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে পৈতৃক সত্তার মূল্য আজ অনেক বেশি মনে হয় দীপার কাছে।

শরতের পড়ন্ত রোদে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় দীপা। আজ প্রকৃতি বড় শান্ত। সুনীল আকাশে মেঘশাবকরা আপনমনে ভেসে যাচ্ছে। মৃদুমন্দ বাতাস আন্দোলিত করছে কাশবন। বেশ কিছুটা দূরে পাড়ার ক্লাবে এর মাঠে কিছু ছেলে ফুটবল খেলছে। বল পায়ে সবাইকে পাশ কাটিয়ে ওটা কে স্থির লক্ষ্যে ছুটে যাচ্ছে গোলের দিকে ? সার্থক না ?

ছেলেকে এত কাছ থেকে কোনোদিনও দেখেনি দীপা। দেখলে হয়ত ''শৈশব'' গল্পটা অন্যরকম ভাবে লেখা হতে পারত।

---

**মৈনাক চৌধুরী** — জন্ম হাওড়ার রামরাজাতলায়। বেড়ে ওঠা মফস্বলে। পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়র। এখন কর্মসূত্রে আমেরিকার কানেক্টিকাটের বাসিন্দা। অনেক ভালোলাগার মধ্যে লেখালেখি অন্যতম। গতানুগতিক, ব্যস্ত জীবনের বদ্ধ চারদেওয়ালের মধ্যে লেখালেখি ও সাহিত্যচর্চা যেন ব্যালকনির খোলা হাওয়া নিয়ে আসে। অন্যান্য সখের মধ্যে চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, খেলাধূলা এবং অবশ্যই সঠিক বৃত্ত পেলে জমিয়ে আড্ডা মারা।

# শাশ্বতী বসু

## মাতৃ রূপেন .....

সামনে স্তূপাকৃত বই – লাবণি পালংকে আধশোয়া হয়ে একটার পর একটা বই ঘেঁটে যাচ্ছে। বইগুলো সব বড় পিসিমার সংগ্রহ। তিনটে বিশাল বিশাল আলমারী ভর্তি বই। সবই প্রায় তার। কি করে সম্ভব হলো কে জানে ! সেই উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাইশ বছরের বিধবা হয়ে বাবার বাড়ী বাংলার এই অজপাড়া গাঁয়ে তিনি ফিরেছিলেন বালক ছেলেটির হাত ধরে। এরপর শুরু হয়েছিল তার কঠোর বৈধব্যজীবন ও সেই সংগে বই পড়ার নেশা। তার ধনী ভুস্বামী বাবা তার এই বই-এর নেশাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ক্রমাগত অকৃপণ ভাবে কলকাতা থেকে বই আনিয়ে দিয়ে।

কি নেই এই সংগ্রহে – ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাস, অনুরূপা দেবীর মন্ত্রশক্তি, বঙ্কিমচন্দ্র, কোন এক লেখকের নাম পড়া যাচ্ছে না . . . . তার  মাধবীকঙ্কন, জীমূৎবাহন মুখোপাধ্যায়ের রান্নার বই . . . .

– জামাকাপড়গুলো একটু মেলে দিস লাবু ..... মায়ের গলা শোনা যায় বাইরে। লাবণি বাস্তবে ফিরে আসে। ধীরে ধীরে পালঙ্ক থেকে নেমে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

আজ সপ্তমী। দুর্গাপুজোর। সকাল সবে আড়মোড়া ভেঙে উকি মারছে। কুসুম কুসুম নরম রোদ যেন পেয়ালা উপচে পড়ছে ধীরে ধীরে। দু পা এগোলেই পুজো মণ্ডপ ঢাকের আওয়াজ এখনো শুরু হয়নি। তবে শুরু হতে যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে। লাবণি একটু আগেই পুজো মন্ডপ ঘুরে এসেছে। সোনাদা নতুন ধুতি মালকোঁচা মেরে পরে কোমরে লাল নতুন গামছা বেঁধে পুজোর যোগাড় করে চলেছেন। মা কাকীমারা চান করে তৈরী হচ্ছেন – একটুক্ষণের মধ্যে তারাও যোগ দেবেন এই মহা পুজোর আয়োজনে।

ইতিমধ্যে যোগাড় হয়েছে ফুল। নতুন বাঁশের তৈরী বিশাল চুবড়িতে রাশিকৃত শিউলি আর স্থলপদ্ম রাখা হয়েছে। পঞ্চজবা আর নীল অপরাজিতাও রয়েছে। আছে নীলপদ্ম।

সপ্তমীতে আজ নীল অপরাজিতা গাঁথা হবে। সে মালা মায়ের পা স্পর্শ করা চাই। অষ্টমীতে আসবে একশ আটটা নীলপদ্ম। নবমীতে হবে শালুক ফল আর ভেজা আতপচালের ভোগ অন্য আরো সব উপাচারের সঙ্গে। এই ভোগ নিয়ে একটা কাহিনী চালু আছে লাবণিদের বংশে।

লাবণিদের এই পুজো বংশ পরম্পরায় চলে আসছে বহুকাল ধরে। কবে যে প্রথম এই পুজো শুরু হয়েছিল এই গ্রামে তবে সে ইতিহাস তার অজানা। তবে বাংলা ১৩২৬ সালের বিধ্বংসী ঝড়ে যেবার বাংলার কিছু অংশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছিল সেবারও নাকি লাবণিদের এই পুজো হয়েছিল এবং হয়েছিল শুধু শালুক আর আতপচাল দিয়ে। বিশ্বাস যে মা চন্ডিকা চেয়েছিলেন বলেই এটা হয়েছিল। তাই আজও ভোগের অন্যতম উপাচার এটি। ঠাকুরের পায়ের কাছেই রাখা রয়েছে শালুক ফুলের গোড়াগুলো। মায়ের পায়ের চারপাশ ঘিরে এখন পঞ্চ দেবতার জন্য ঘট বসানো হচ্ছে ।

মায়ের বর্ণ কাঁচা সোনার মতো। পলাশ রাঙা আয়ত আঁখি তাতে যেন স্নেহ ঝরে পড়ছে ঠিক যেন মনে হচ্ছে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এসেছে। লাবণি অজান্তেই আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে এই স্নেহময়ীকে ।

– কাপড়গুলান আমি মেইল্যা দি তারে ?

– কার কণ্ঠ স্বরে লাবণির সম্বিৎ ফেরে। চমকে মুখ ফেরায় সে।

– কে ? অস্ফুটে বলে লাবণি ।

এক স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে । গরীব এক বিধবা বয়স্ক মহিলা হাসছে – দন্তহীন, সায়া ব্লাউজ হীন, শরীরে ময়লা বিবর্ণ একটা মোটা ধুতি অদ্ভুত কায়দায় পেঁচিয়ে পড়া লাবণির দিকে তাকিয়ে আছে সস্নেহে ।

– কি হলো ? কি বলছো ?

– না কিছু কই না অ্যামনি ।

লাবণি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল । তাড়াতাড়ি মায়ের ধোয়া জামাকাপড়ের বালতিটা তুলে নিয়ে উঠোনের কোণে আটকানো লোহার তারের দিকে এগোয় । বালতিটা মাটিতে রাখে । নিচু হতেই ওর খোঁপা খুলে চুলগুলো ছড়িয়ে পড়ে । কৃষ্ণ কালো কোমর ছাড়ানো চুল লাবণির সে আবার সোজা হয় চুল সামলাতে ।

তারও তোমার মতোই চুল ছ্যাল – এমনি এক ঢাল – সে তোমারই মতো ছ্যাল – অ্যামনি বালিয়া মাছের মতো নরম সরম . . . মহিলা এক অদ্ভুত স্নেহ মিশ্রিত চোখে লাবণির দিকে বলে যেতে থাকে । এই ধরণের মহিলা এই গ্রাম্য জীবনে নতুন কোনো চরিত্র নয় লাবণির কাছে – নয় নতুন কোনো অভিজ্ঞতটাও । লাবণিরা থাকে শহরে । প্রতি বছর এই পুজোর কটা দিনই ওরা গ্রামে এই পৈতৃক ভূমিতে আসে । যে কদিন এখানে থাকে সেই কদিন ওরা একটা দর্শনীয় বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয় । দর্শকের হরদম আনাগোনা এবং তাদের নিঃসংকোচ স্বীকারোক্তি ও লাবণি জানে । তারা বলে 'আমরা তুমাদের দ্যাখতেই আসি' ।

তাই এই মহিলাকে দেখে লাবণি চমকায় না বিশেষ । জামাকাপড় মেলে আবার পালঙ্কে ফিরে আসে ।

রান্নাঘর থেকে কর্পূর আর নতুন গুড়ের গন্ধ আসছে । কি হচ্ছে সকালের জলখাবার কে জানে ? লাবণি আজ অঞ্জলি দেবে তারপর খাওয়া দাওয়া । লাবণি আবার বই গুলোর দিকে মন ফেরায় ।

সে যে গেলো আর কুনো দিনও তারে দেখলাম না – সে আর ফেরলো না . . .

এবার লাবণি চমকায় । দেখে সেই হতকুচ্ছিত মহিলা দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলছে ।

– একদিন গ্যাল . . . দুই দিন, বছর গ্যাল – সে আর আসলো না – কত খুঁজ করলাম – মহিলার গলা ধরে আসে ।

– লাবণি এবার চকিত হয় । বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে

– কাকে পাওয়া গেলো না ?

– আমার মেইয়েরে রে . . .

– সেকি তুমি পুলিশ এ খবর দাও নি ?

– ফুলিশে আর কি করব ? বলে ফটক দাও – ফটক কুথা পাই ? কত কান্দলাম ফুলিশের পা ধইরে – আমার সামুরে আইন্যে দ্যাও – তা শোনলো কই ?

মহিলার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে । লাবণি কি করবে ভেবে পায় না ।

হে ঠিক তোমার পারা দেখতে আছিল – আই চুল – আই বন্ন – মনে লয় হে ভুলেই আসছিলো – তাই তো তারে রাখতে পারলাম না – কুথায় যে গেল – হাহাকার করে ওঠে মহিলা ।

পুজোর সুন্দর সকাল – তা এক মুহূর্তে বিস্বাদ হয়ে যায় লাবণির কাছে। উঠে এসে মহিলার পিঠে হাত রাখে লাবণি।

কিন্তু কি বলবে ভেবে পায় না –

– আবার তুই এখানে ? কি করছিস কি এখানে তুই ? কতবার বলেছি না দরজায় ওরকম মাথা ঠেস দিয়ে দাঁড়াবি না – ঘরের ভিতর পা দিবি না – তা কে শোনে কার কথা। যা এখন এখান থেকে দুপুরে পাত পাড়ার সময় আসবি আবার ।

কঠিন স্বরে কথাগুলো বলে রেবা বৌদি – পুজোর কদিন রান্নাঘরের চাপ সামলানোর মহা দায়িত্ব যার কাঁধে। চলো লাবি, বৌদি ডাকছে খৈ-এর ছাতুর মোয়া হয়েছে গুড় আর কর্পূর দিয়ে খেয়ে নেবে ।

– আমি অঞ্জলি দিচ্ছি খাবো না – লাবু নিরাসক্ত মুখে বলে।

– আহা খাটো দাঁড়িয়ে থাকিস না – পরে আসবি। ওকে আমরা খাটো বলে ডাকি। বলে রেবা বউদি তড়িৎ গতিতে ঘর ছাড়ে।

মহিলা চোখ মোছে। একটুক্ষণ দাঁড়ায় – অনেক কষ্টে ফোকলা দাঁতে হাসে। চলে যাবার জন্য এগোয় – আবার পেছন ফিরে লাবণির দিকে তাকায়। সে চোখে স্বচ্ছ মাতৃস্নেহ যেন ঝরে ঝরে পড়ছে। অস্পষ্ট স্বরে বলে – যাই।

আশ্চর্য চোখ তো ! কোথায় এ চোখ যেন সে দেখেছে ! কোথায় ! একটু আগে পুজো মণ্ডপে কি ? মা দুর্গার চোখ ? কিন্তু সে তো পলাশ নয়না – দীর্ঘ্য ঘন পল্লবে ঢাকা চোখ ! এই হত কুচ্ছিত মহিলার চোখের সাথে তার কোথায় সাদৃশ্য ? লাবণি কিছু বুঝতে পরে না। কিন্তু একটা মিল যে কোথাও আছে সেটাও অনুভব করে। একটা রিনরিনে ব্যথার ঢেউ তার মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ততক্ষণে মণ্ডপের ঢাকের বাজনা শুরু হয়ে গেছে। শরতের পুজোর সকাল আবার কর্ম মুখর – ঢাকের বাজনা যেন তারই ইঙ্গিত।

পুজোর চারটে দিন তারপর কিন্তু লাবণির আনন্দেই কেটে যায়। রোজ সকালে স্নানের পর নতুন শাড়ীর গন্ধ মেখে অঞ্জলি দেওয়া – হৈ হৈ করে প্রসাদ খাওয়া – একসাথে এক লাইনে ভাই বোন দের সাথে মেঝেতে বসে কলাপাতায় দুপুরের খাওয়া – বিকেলে কাসুন্দি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বাতাবি লেবু মাখা খাওয়া – সন্ধ্যায় ধুনুচি নাচ – রাতে কাকা জ্যাঠা দাদাদের ঐতিহাসিক নাটকে রাংতার তরোয়াল দিয়ে ভয়ানক যুদ্ধ আর স্টেজে আচমকা খুলে পড়া মহামান্য রানা প্রতাপের গোঁফ দেখে হেসে গড়িয়ে পড়া – এসবের মধ্যে সপ্তমীর সকালের সেই মন খারাপের বোধটা একদম উধাও হয়ে গেছিলো ।

কিন্তু দশমীর দিন দর্পণ বিসর্জনের পর মা দুর্গা কে যখন মন্ডপ থেকে উঠোনের প্রশস্ত চত্বরে নামানো হলো তখন মা দুর্গার চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে লাবণি। একি ? মা কি কাঁদছে ? নাকি হাসছে ? একাধারে অপার স্নেহের হাসি অন্য দিকে বিদায়ের বিষাদ যেন দু চোখ ভরে আছে। লাবণি আবার ও চমকায়। এই বিষাদ স্নেহ মাখানো চোখ যেন কোথায় দেখেছে ও ? কোনো মনুষ্য মূর্তিতে কি ? সেই কন্যা হারা কুচ্ছিত মহিলার চোখে নয় তো ? লাবণি বিদ্যুৎ পৃষ্ট . . .

সময় গড়ায় তার নিজস্ব গতিতে। লাবণির জীবনও কাটে তার নিজস্ব ছন্দে। ঠিক হয় একদিন লাবণিরা শিলং বেড়াতে যাবে। লাবণির বাবা ডাক্তার মিত্রর এক বন্ধু ডাক্তার উইলিয়ামস শিলং-এর এক মিশনারি হাসপাতালের ডাক্তার। তিনি অনেকদিন ধরেই ডাক্তার মিত্রকে বলছিলেন তাদের হাসপাতাল দেখে আসার জন্য। ডাক্তার মিত্রও একজন ব্যস্ত ডাক্তার – গাইনি . . . এবং ব্যক্তিগত জীবনে ভ্রমণে নিরাসক্ত। তাই তার কোনোদিনও বন্ধুর এই আমন্ত্রণ রক্ষা করা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ডাক্তার উইলিয়ামস-এর জার্মানিতে হাসপাতালের মেইন শাখায় বদলি হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় ডাক্তার মিত্রকে এবার বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করতে যেতেই হলো ।

শিলং এ পৌঁছে লাবণিদের কিছুদিন খুব বেড়ানো হলো। কমলার ভারে নিচু হয়ে যাওয়া হলুদ আলোয় ভরা কমলার

গাছ – বাটারফ্লাই মিউজিয়ামে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রজাপতি দেখা, দুরে অস্পষ্ট মাউন্ট এভারেস্টের চুড়ো তে সূর্যদয় – দিগন্তে পাহাড়ের উত্তুঙ্গ চড়াই উৎরাই – হঠাৎ হঠাৎ ভেসে আসা লো ক্লাউডে ভিজে যাওয়া – লাবণির দিনগুলো ভালোই কাটলো ।

ফেরার আগের দিন ডাঃ উইলিয়ামস একটা বড় পার্টির আয়োজন করলেন ডাঃ মিত্রর অনারে। হাসপাতালের একটা কোনার দিকে ডাঃ উইলিয়ামস-এর কোয়ার্টার। নির্দিষ্ট দিনে লাবনিরা ওখানে পৌঁছে গেলো। ডাঃ উইলিয়ামস প্রবেশ পথের মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। উনি লাবণিদের সাদরে ভেতরে নিয়ে গেলেন ।

সুদৃশ্য ঝাড় লন্ঠনের নরম মৃদু আলোর নিচে পিচ কালার নিচু নরম সোফায় পানীয় নিয়ে অভ্যাগতরা গল্প করছেন। ঘরে এক অদ্ভুত নরম আলোর উদ্ভাস – কিন্তু আলোর উৎস ঝাড়লণ্ঠন ছাড়াও আরও অন্য কোথাও আছে। কোথায় লাবণি সেটা ঠিক ধরতে পারলো না। হালকা একটা সুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সমস্ত পরিবেশটাই বেশ সমিত আর মৃদু পরদায় বাঁধা ।

লাবণি দেখছিলো আমন্ত্রিতদের প্রায় বেশির ভাগই বিদেশী এবং বিদেশিনী – ভারতীয় নেই বললেই চলে। লাবণির সমবয়সীও কেউ নেই। ডাঃ উইলিয়ামস অকৃতদার। সুতরাং সেখানেও শূন্যতা। লাবণি কি করবে কোথায় বসবে ভাবছিলো। মা বাবা কথা বলছে কয়েকজনের সাথে। বোন ছোট বলে ওদের সাথেই আছে। কিন্তু লাবণি কি করবে একটা অরেঞ্জ জুস্ নিয়ে সেটাই সে ভাবছিল।

– হ্যালো ইয়াং লেডি – আয়াম ডরোথি – আর এই আমার হাসব্যান্ড ডেভিড – বলে হাত বাড়ায় ডরোথি লাবণির দিকে । আমরা এই হাসপাতালে কিছুদিন হল আছি। অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছি। আমি পেসেন্টদের অজ্ঞান করি – ডেভিড প্যাথলজিস্ট – বলে আবার হাসে ডরোথি ।

– লাবণি – গ্রেড ইলেভেন – পিওর আর্টস – বলে সে হাসিমুখী ডরোথি কে। ততক্ষণে ডরোথিকে তার পছন্দ হয়ে গেছে ।

– পিওর আর্টস ? হাও কাম ? তুমি এমন একটা বাবার মেয়ে যিনি নাম করা মেডিকেলম্যান – তুমি আর্টস নিলে ?

– ডিসেকশন এ এলার্জি – আই মিন ব্লাড দেখলে আমার যেন কি রকম লাগে – বলে লাবণি।

– ওহ পুওর গার্ল। বলে ডরোথি আরও একচোট হেসে নেয়। হাসে ডেভিডও। বলে – তোমরা গল্প করো আমি একটা ড্রিংক নিয়ে আসি . . .

– তোমার শাড়ীর রং টা খুব সুন্দর। এতো সুন্দর লাগছে তোমাকে দেখতে যে কি বলবো – বলে লাবণির দুধে আলতা রং শাড়ীটার দিকে নির্দেশ করে ডরোথি। আর দেখছি তোমার হাইট average ইন্ডিয়ান মেয়েদের চাইতে বেশ বেশি . . . তুমি কত লম্বা লাবণি ?

– পাঁচ সাত। লাজুক মুখে বলে লাবণি। ডরোথি বেশ বেশি বেশি বলছে বলে তার মনে হয়। তাই সে তৎপর হয়।

– তোমার ড্রেস টাও খুব সুন্দর – কেমন পান্না সবুজ।

– ইতিমধ্যে ডেভিড ফিরে এসেছে। বলে চলো খাবার দিয়েছে দেখলাম টেবল-এ। আমরা একজায়গাতেই বসবো ।

ডিনার টেবিলে ডরোথির পাশেই বসে লাবণি। তারপাশে বোন। তারপরে মা। লাবণির উল্টোদিকে ডেভিড। লম্বা টেবিল। দুধারে অন্তত ষোলো জন বসেছে। ঝক্ ঝকে রুপোর কাঁটা চামচ – ভাঁজকরা কটনের ন্যাপকিনে একদম ইফরোপিয়ান আদবকায়দা। শিলং এর ডাঃ কাকু যে একজন কেতাদুরস্ত ইউরোপিয়ান এটা জানতো না লাবণি।

– তুমি ভেজিটেরিয়ান নও তো ? ডরোথি জিজ্ঞেস করে লাবণিকে।

– না না সশব্যস্তে লাবণি বলে

– তাহলে চিকেন স্যানিটযল টা খেয়ে দেখো। ওটা ডাঃ উইলিয়ামস-এর কুক-এর স্পেশাল আইটেম।

– না না মাস্টার্ড না – হোয়াইট সসটা দিয়ে খাও।

লাবণি তাই করে। একটা আঁশটে গন্ধ আশঙ্কা করেছিল। সেটা নেই। – স্যালাডটা নিও – গ্রিন্স-এর বোলটা লাবণির দিকে রেখে ডরোথি খুব স্বাবাভিক ভাবে খেতে থাকে ।

বোনের পাশে বসে মা মুচকি হাসে চোখ দিয়ে। ডরোথি যে কন্যা স্নেহে লাবণির খাওয়া তদারক করছে সেটা তার দৃষ্টি এড়ায়নি। বলেন

– ভালোই হলো ডরোথি লাবণি আপনার পাশে বসেছে। খাওয়া নিয়ে ওর বড্ডো খুঁত খুঁতুনি ।

– সে কি লাবণি তুমি খেতে চাও না ? কেন কি হয়েছে ? উল্টোপাল্টা ডায়েটিং করলে কিন্তু তোমার মেন্টাল গ্রোথও নষ্ট হবে।

– ডায়েটিং করছি না তো। আমি এরকম করেই খেতে ভালোবাসি। মৃদু স্বরে বলে লাবণি ছুরি দিয়ে ছোট এক টুকরো মাংস কাটতে কাটতে।

– সেও কিন্তু খুব রোগাই ছিল – মৃদু স্বরে বলে কথাটি। কিন্তু লাবণির কানে এড়ায় না কথাটি ।

– কিছু বললেন ?

– না কিছু নয়। ডরোথি অন্যমনস্ক ভাবে বলে। লাবণির মনে হয় ডরোথি যেন মুহূর্তের জন্য ডিনার টেবিল ছেড়ে অন্য জগতে চলে গেছে। তারপরে কথাবার্তা বিশেষ জমে না। টুক টাক কথাবার্তার মধ্যে খাওয়া শেস হলে সব এদিক ওদিক ছড়িয়ে পরে। লাবণি ডরোথিকে দেখতে পায়না বসার ঘরে। খুঁজতে খুঁজতে ওর চোখ পড়ে বারান্দার শেস প্রান্তে প্রায়ান্ধকার একটা কোনে সোফাতে প্রায় অর্দ্ধেক ডুবে বসে আছে ডরোথি। হাতে সিগারেট। শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে দূরের পাহাড়ের গা ছুঁয়ে। নভেম্বর মাস। হেমন্তের শিশির ও বুঝি পড়তে শুরু করেছে একটু একটু। আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ। মিটমিটে কিছু তারা। তারই আলোয় বারান্দা থেকে চোখে পড়ছে দিগন্তের পাহাড়ের উঁচু নিচু ঢেউ – ছায়া আর আলোতে ঘেরা। বুঝি অনেক রহস্য সেখানে।

– বস লাবনি। মৃদু স্বরে বলে ডরোথি ।

লাবণি বসে ডরোথির পাশের সোফাটিতে। ডরোথির মুখ থমথমে – যেন ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ। লাবণি শঙ্কিত হয়। জিজ্ঞেস করে আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে ?

না। তবে বলতে পার – মন খারাপ লাগছে। হঠাৎ অনেক কিছু – অনেক অনেক কিছু হুড়মুড় করে মনে পড়ে গেছে। যেগুলো আমি সযত্নে এড়িয়ে যাই – মনে করতে চাই না। তাই এত কষ্ট হচ্ছে লাবণি – লাবণি তুমি আমাকে সব মনে পড়িয়ে দিয়েছ – লাবণির এক সমুদ্র বিস্ময়ের সামনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ডরোথি।

– ওকে আমি দিয়ে দিয়েছিলাম জানো – টু বি এডপটেড। ওই প্রথমদিন – ওই হবার পরে পরেই – এই এতটুকুন ছিল – এই টুকুন পাখির বাচ্চার মত – কি করে ওকে আমি দিয়ে দিলাম – কেন দিলাম – কি করে পারলাম? এখনো আমি ভাবি।

আমি তো অনায়াসে ওকে রাখতে পারতাম – স্বীকার করতে পারতাম আমার মুহূর্তের ভুলের সন্তানকে – না হয় আমার নিন্দে হত – লোকে ছি ছি করতো – সমাজ তখন আমাদের স্কটল্যান্ডে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ওরকমই ছিল লাবণি। কেউই আনম্যারেড মা'কে ভাল চোখে দেখত না। স্কুলে ভরতি করা যেত না – সমাজে তাদের জন্য কোন সুস্থ জায়গা ছিল না। তাই তো ওকে দিয়ে দিয়েছিলাম চোরের মত চুপিচুপি। ওই দিনই – যে দিন প্রথম সে পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছিল সেইদিনই – কি নিষ্ঠুর – কি নিষ্ঠুর অথচ সেদিন আমার এত মন খারাপ হয় নি। আর আজ? আমার স্বামী ডেভিড মাটির মানুষ – সন্তান আছে আমার চারজন – তারা সব বড় হয়ে গেছে – তবু আমার সন্তান ক্ষুধা মিটল না – এখনো আমার সেই এক রত্তি পুতুলটার জন্য বুকটা ফেটে যায় –।

লাবণি পাথরের মত চুপ করে বসে থাকে। অনুভব করে ডরোথি ওর হাতটা শক্ত করে ধরে আছে। কিন্তু কাঁপছে থরথর করে।

– লাবণি তোমায় দেখে কেন জানি আজ আবার আমার সেই হারানো মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল ।

– খোঁজেননি তাকে ? অস্ফুটে বলে কোনরকমে লাবণি ।

– করেছিলাম – আমি ডেভিডকে বলেছি তার কথা। ডেভিড আমায় ক্ষমা করেছে। ছেলেমেয়েরা বলেছে কেন আমি আরো আগে তাদের সেই বোনের কথা বলিনি – তাহলে তারা আরও আগে থেকেই তাকে খুঁজতে শুরু করতে পারত। তারপর আমরা সবাই খুঁজতে শুরু করি তাকে।

– তারপর ? পেয়েছিলেন তাকে ? রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করে লাবণি ।

– হ্যাঁ তাকে পেয়েছিলাম। তবে – তবে – এবার হু হু করে কাঁদতে থাকে ডরোথি। তবে সে আমায় ক্ষমা করেনি লাবণি। ক্ষমা করেনি – সে আমাকে অবজ্ঞা করে চলে গেছে। এমন মায়ের মুখ সে নাকি দেখতে চায় না। জান লাবণি সে মেয়ে ঠিক তোমার মত দেখতে – তোমার রঙ – তোমার হাইট – তোমার চোখ মুখ – হাহাকার করে ওঠে ডরোথি ।

– তুমি – তুমি আমায় ঘেন্না করবে না তো লাবণি – ভুলে যাবে না তো ? আকাশের তারার অস্পষ্ট আলোয় ডরোথি ওর দিকে আকুল হয়ে তাকায়। সে দিকে তাকিয়ে থর থর করে কেঁপে ওঠে লাবণি। স্নেহে বিষাদে করুণায় ডরোথির চোখ তখন অপরূপ হয়ে উঠেছে। এ চোখ সেই গ্রাম বাংলার হত কুচ্ছিত মায়ের – এ চোখ সেই বিসর্জনের দিন মণ্ডপের প্রতিমার – এই চোখ সেই এক চিরকালিন মাতৃত্বের – ?

লাবণি কথা বলে না। শুধু তাকিয়ে থাকে ডরোথির দিকে – সে জানে না তার নিজের চোখও সেই একই রূপে ততক্ষণে অপরূপ হয়ে উঠেছে।

---

**Saswati Basu** — Profession: University Teacher in Economics, lives in Sydney.

I enjoy this beautiful life thoroughly. Particularly I enjoy listening to songs, reading books on sociology, short stories, and travelling around. I love watching drama, good cinema and tennis. I also love to experiment with new cooking recipes and share them with our friends. Believe in donating money to voluntary organisations for the people in need.

পবিত্র চক্রবর্তী

# মন্দোদরী ও দশগ্রীবের শেষ রাত

১

অবশেষে ত্রিকূট পাহাড়ের চূড়ায় যে অন্তিম রশ্মি লেগেছিল, তাও একটু একটু করে নিভে গেল। লঙ্কাপুরীর মশালে যে কটা ক্ষীণ আলো শেষ নিঃশ্বাসের মত বুকের জোর দেখাচ্ছে, তাতেই উজ্জ্বল এক স্বর্ণ আলোর বিচ্ছুরণ বোঝা যায় দশগ্রীব এখনো রাজসভায় রত্ন সিংহাসনে। তবে একা, সম্পূর্ণ বান্ধবহীন। মুখে বিষাদের মধ্যেও কোথাও যেন একটা পরিতৃপ্তির আস্বাদন। এ অভিব্যাক্তি একান্তই যেন তার নিজস্ব ।

আগেই বিদায় করেছেন চামরধারীদের। সময় যত গড়াচ্ছে মহামহিম দশগ্রীব শান্ত, সংহত হচ্ছেন। দৃঢ় প্রত্যয় তার প্রতি রন্ধ্রে জেগে উঠছে। অকস্মাৎ দুই হাতে তালি দিয়ে উঠলেন। রাতের নির্জনতায় সোনার লঙ্কায় প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো সে শব্দ।

ত্রিকূট পাহাড়ে যে ময়ূর ময়ূরী দিনাবসানের ক্লান্তির তন্দ্রায় ছিল, সন্তানহারা প্রজারা অগ্নিকুণ্ডের সামনে নীরবে চোখের জল ফেলছিল, অশোকবনে যে চেড়িরা দেবী সীতার পাহারায় অতন্দ্র ছিল, যে নদী ছলছল কলকল রবে সোনার লঙ্কার যুদ্ধ ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে নানা স্মৃতি বহন করতে ভারত মহাসাগরে গিয়ে মিশছে, ক্ষণিকের জন্য যেন সচকিত হয়ে উঠল।

দশগ্রীবের গম্ভীর আর্তরব আগেও শুনেছে তারা। দৈত্যরাজকন্যা পুষ্পৎকটার রূপে মুগ্ধ হয়ে মহর্ষি পুলস্তের পুত্র বিশ্রবাঃ তাকে দশদিন ধরে সম্ভোগ করেন এবং অবলা সেই পুষ্পৎকটা জন্ম দিয়েছিলেন রাবণকে। জন্মকালে তার অতিমানবীয় শিশু-কান্না সর্বলোকে কম্পন সৃষ্টি করেছিল . . . না জানি কী হয় এই ভয়ে।

আর আজ এই গভীর রাতে সেইরকম ধ্বনি। যদিও এই ধ্বনির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, রাজা এখন রাজনর্তকীর নৃত্য দেখতে চান।

লঙ্কেশের সভায় এখন মৃদঙ্গ-রুদ্রবীণা ইত্যাদি বাদকবৃন্দ। নর্তকীরা নিপুণ মুদ্রায় সুললিত ছন্দ তুলে চলেছে। কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না। ক্ষণিক আনন্দ আর দশাননের হৃদয়ে তুলছে না দীর্ঘ শান্তি। অবশেষে তিনি নীরবে সবকিছু ফেলে ধীর এক অপরিচিত লয়ে চললেন রাজ অন্তপুরে। যেখানে তার প্রিয় পত্নী দেবী মন্দোদরী রয়েছেন। কী জানি অসুররাজ ময়াসুর ও অপ্সরা হেমার কন্যা মন্দোদরী আজও সকল অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে অপেক্ষা করে আছেন কিনা !

এই প্রথম রাবণের বুকের এক অজানা জাগতিক ভয় হতে শুরু করল। দুই হাত দিয়ে চন্দন কপাট খুললেন। ঘরের অন্দরে উজ্জ্বল দীপ অনেকটাই নিষ্প্রভ। সহচরী আজ আর নেই এ ঘরেও। সামনেই পড়ে রয়েছে রত্ন খচিত পালঙ্ক। মহিষী কোথায় ! মন্দোদরী কী তবে আজ তাকে ফেলে রেখে চলে গেছেন পিত্রালয়ে !

রাবণ সেই বিশাল পালঙ্কের একপ্রান্তে বসে পড়লেন। কয়েক সের ওজনের স্বর্ণ-রত্ন বেষ্টিত বিশাল রাজমুকুট খুলে রাখলেন। তিনি বিশ্রাম চান। আগামী প্রভাতেই তার হয়তো মুক্তি। দুচোখে তার শ্রান্তির ঘেরাটোপ।

“রাজন, তুমি ঘুমাতে চাও ? কেন এই ঘুম তোমার চোখে আজ !” মন্দোদরীর আবেগহীন দৃঢ় কণ্ঠস্বরে মুখ তুলে চাইলেন লঙ্কেশ। মনে হল এ যেন তার প্রিয়সখী প্রাণাধিক প্রিয় পত্নী মন্দোদরীর কণ্ঠস্বর নয়। এ যেন হিমালয়ের বুকে জমাট তুষার ভাঙনের নিনাদ।

"মন্দোদরী, আমি ক্লান্ত। হে শিব-স্বয়ম্ভু একটু ঘুম দাও এই দুই চোখে।" রাবণের কণ্ঠে প্রথমবার আর্তির সাক্ষী থেকে গেল কেবল অন্তপুরে দীপ্যমান অগ্নি বর্তিকার প্রায় নিস্প্রভ অগ্নি শিখারা ।

"কিন্তু রাজা, তুমি কেবল নিজেরটাই ভেবে গেলে ! আমার অন্যায় কোথায় ? না না, আমি তোমাকে ঘুমাতে দিতে পারি না।"

"তুমি কী চাও মন্দোদরী ! তুমি কী চাও, আমি পরাজিত হই ? তুমি কী চাও কালের পৃষ্ঠায় লেখা হয়ে থাকুক যুদ্ধের আগে লঙ্কা অধিপতি রাবণ কেবল একবার দুই চোখের পাতা এক করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি ...। বল বল ... বল মন্দোদরী ..." শেষের দিকে রাবণের কণ্ঠস্বরে মনে হল লেগেছে সমুদ্র বাষ্পের মত একরাশ লবণাক্ত অজানা অভিমান ।

"চমৎকার রাজা চমৎকার ! ওঠো, চল। চল সমুদ্রতটে। এই অন্তপুর এখন আমার কাছে কেবলমাত্র জতুগৃহ। এখানকার বাগিচার পুষ্প, যা প্রতিদিন আমার পায়ে নুপুরের মত বেষ্টন করে থাকে, তারা যেন আজ আমার এই দেহে নাগপাশ। সারা শরীরময় বিষের জ্বালা। তুমি ওঠো রাজা, চলো !" মন্দোদরীর এই নিষ্পাপ আবেদনে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারলেন না রাজা দশগ্রীব ।

২

সেইদিন যেদিন লঙ্কার আকাশে একটা কালো শকুন অনেকটা নীচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, যেদিন তার দুই পাখায় উচ্চারিত হচ্ছিল, " হায় ইন্দ্রজিৎ হায় ইন্দ্রজিৎ"।

যখন লঙ্কায় আর্য রাম সীতাকে উদ্ধারের জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন, সেইদিনই মেঘনাদ সুলোচনার কথা উপেক্ষা করেছিলেন ।

স্বামীকে কাতর স্বরে সুলোচনা বলেছিলেন, "তুমি তো বলশালী, তবে কেন নিকুম্ভিলা যজ্ঞের আয়োজন। মন বড়ই চঞ্চল হয়ে উঠেছে।"

মেঘনাদ মৃদু হেসে বলেছিলেন, "প্রিয়ে অনার্য যে কম নয় তার প্রমাণ রেখে যাবো ইতিহাসের গর্ভে।"

রাজমাতা মন্দোদরী বুঝেছিলেন পুত্রবধু সুলোচনার হৃদয়ে কেন এই ঝড়ের সংকেত। তিনি পরম স্নেহে বুকের মধ্যে আশ্রয় দিয়েছিলেন আরেক অবলা নারীকে ।

রাবণ লঙ্কা ছেড়ে তিন যোগ্য পুত্রের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করে ত্রিলোক জয়ে বেরিয়েছিলেন। আর ঠিক তখনই লঙ্কার এক মনোরম উপবন নিকুম্ভিলায় মেঘনাদ অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, রাজসূয়, গোমেধ, বৈষ্ণব ও মাহেশ্বর নামে সাতটি যজ্ঞ সম্পাদনা করেন। এই যজ্ঞসমূহের ফলে তিনি শিবের কাছ থেকে কামগ স্যন্দন, তামসী মায়া, অক্ষয় ইষুধি ও আরো অনেক অস্ত্রশস্ত্র লাভ করেন।

যজ্ঞের কোন ত্রুটি রাখেন নি। পরম অনুশীলনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন দেবকুল। আশীর্বাদও করেছিলেন ।

অবশেষে এক সন্ধ্যায় দিগ্বিজয় করে আনন্দ উল্লাস আর জয়ধ্বনির মাঝে খুলে যায় লঙ্কার তোরণ। তুরী ভেরী নানা বাদ্যের মাঝে লঙ্কাধিপতি প্রবেশ করেন মহলে। মন্দোদরী প্রথা মেনে রাজটীকা পরিয়ে দেন। পরম যত্নে ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে দেন।

ইন্দ্রজিত পিতাকে প্রণাম করে সেদিন সন্ধ্যায় ভেবেছিলেন অনেক আশিস করবেন রাবণ। কিন্তু হায় ইন্দ্রজিত ! সে জানতো না বৈষ্ণব যজ্ঞ করার জন্য রাবণ অতিশয় বিরক্ত হয়ে তীব্র ধিক্কার করবেন।

মা আবার অন্যদিকে রানী মন্দোদরী সে রাতে তাদের মাঝে অন্তরাল না হলে রাবণের কোপে ইন্দ্রজিত হয়তো ...!

নাহ। সেদিন মন্দোদরীর সামনে কিছুই আর করেন নি তিনি বরং ইন্দ্রজিতের মাথা যে পুরোহিত খেয়েছিলেন সেই শুক্রাচার্যকে বারবার ধিক জানিয়েছিলেন।

রাবণ হয়তো জানতেন, তাই তিনি বলে উঠেছিলেন উপস্থিত আচার্যের দিকে তাকিয়ে, "আর কতদিন অসুরকুলের সর্বনাশের জন্য ছল পৌরোহিত্য করবেন ? দেবতারা নানা অস্ত্র দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আপনিই বলুন তো যে দৈবশক্তিতে আজ ইন্দ্রজিৎ সাজিয়ে তুলেছে তার অস্ত্রভাণ্ডার সেই অস্ত্রের আড়ালেই দেবকুল ওর মৃত্যুবাণ লুকিয়ে রেখে গেল কিনা ?"

বিস্মিত মন্দোদরী স্বামীর এরূপ কথায়। হাহাকার করে ওঠে তার বুক।

করুণ আর্তি মেশানো স্বরে তিনিও বললেন, "এ কী করলেন আচার্য ! আপনি আমার কথা, এক মায়ের কথা ভাবলেন না ? সুলোচনার কাছে এর উত্তর আপনি দিতে পারবেন তো ?"

শুক্রাচার্য স্থির থাকতে পারলেন না এই যুগপৎ আক্রমনে ।

যজ্ঞের হোতা শুক্রাচার্য কূপিত হয়ে মন্দোদরীর দিকে রোষ দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর রাবণকে শাপ দিয়ে বললেন, "রাবণ, যখন এতোটাই জেনে গেছো তখন এটাও শুনে রাখো তুমি তোমার জামাতার হাতেই নিহত হবে !"

জামাতার হাতে !! এ যে বড় লজ্জার। দুর্ভাগা মন্দোদরী ! কতবার আর কতকাল যে সকল কলঙ্ক নিজের অস্তিত্বে ধারণ করবেন !

৩

এখন সিংহল দ্বীপে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। সামনেই দিগন্ত বিস্তৃত ভারত মহাসাগর। রাতের সমুদ্র পাখীরা কীসের সন্ধানে তীক্ষ্ণ রবে রাতের গভীরতা বাড়িয়ে তুলেছেন। ক্লান্ত রাবণ রত্ন শয্যায় শায়িত। মন্দোদরী ধীরে ধীরে উঠে এলেন মণিময় গবাক্ষের কাছে ।

বাইরে সামুদ্রিক হাওয়া রেশমের মত কোমল চুলে আলপনা কেটে দিয়ে যাচ্ছে ।

" কী পেলাম এ জীবনে ! পরম জ্ঞানী, তপস্বী, শৈব স্বামী সব কী দিতে পেরেছেন ? হ্যাঁ হয়তো পেরেছেন।" কথাগুলো ভাবতে ভাবতে তিনি বেরিয়ে এলেন রাজঅন্ত:পুর থেকে অশোকবনে। এখানে আসতে কোনদিনই বাধা কেউই দেন নি, দশগ্রীবও না। বরং মাঝেমধ্যে তিনিই বলতেন, "যাও মন্দোদরী মেয়েটির কাছে যাও, দেখে এসো কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা।"

" তবে কী স্বামী জানতে পেরেছেন সেই গোপন কথাটি ?" আবার ভাবেন, "সে কী করে সম্ভব ! সেই রাতে দাসী আর সেই তো গেছিল বাধ্য হয়ে বসুন্ধরার কাছে"।

মন্দোদরীর কমলের মত দুই চোখে অশ্রু জমতে থাকে ।

সীতা তখনও ঘুমিয়ে পড়েন নি। বরং নিজের মায়ের চোখে জল দেখে আঁচল দিয়েই মুছিয়ে দিলেন মন্দোদরীর সকল ব্যথা ।

হয়তো এক নারী আরেক নারীর কথা সহজে বুঝতে পারেন। এই দীর্ঘকাল অশোকবনে থাকার সময়ে মন্দোদরী যেমন জানিয়েছিলেন যে তিনিই সীতার হতভাগ্য মা তেমন এটাও বলতে ভোলেন নি রাবণের অপকর্মের কাহিনী।

তিনি বলেছিলেন, "সীতা জানি না আমি ভুল করেছিলাম কিনা ! জানি না দৈব শাপের হাত থেকে মুক্ত করাবার জন্য এ ঘটনা ঘটে চলেছে কিনা ! তাও, আমি কী করে ভুলি, যে আমি স্বামীকে পুজো করি, শ্রদ্ধা করি সেই দশাননই লোভের বশবর্তী হয়েছিলেন।" আজকের রাতের মত সেদিনও মাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিজের হৃদস্পন্দনের সাথে মায়ের স্পন্দন অনুভব করেছিলেন সীতা প্রথমবার।

সে রাতেও মন্দোদরী সজল চোখে বলেছিলেন, "মা লক্ষ্মী, তুই তো সকলই জানিস তাও বলি, রাবণ ঋষিদের হত্যা করে তাঁদের রক্ত একটি বৃহৎ কলসে সঞ্চয় করে রেখেছিলেন। ঋষি গৃৎসমদ দেবী লক্ষ্মীকে কন্যারূপে পাওয়ার জন্য তপস্যা করছিলেন। তিনি দর্ভ ঘাস থেকে দুগ্ধ সংগ্রহ করে তা মন্ত্রপূত করে একটি পাত্রে সঞ্চয় করছিলেন যাতে লক্ষ্মী সেখানে অবতীর্ণ হতে পারেন।"

মন্দোদরী ক্ষণিক কাল মৌন হলেন। দেবী সীতা হতভাগ্য নারী-মা'কে আরো কাছে টেনে নিলেন। কিছুটা শান্ত হলেন তিনি।

পুনরায় বলেন, "একেই বলে ভাগ্য। রাবণ এই দুগ্ধ ঋষিরক্তের কলসে ঢেলে দেন। ঋষিরক্তকে প্রচার করা হয় সকল বিষের চেয়েও বিষাক্ত।

সেদিন আমিই আর বেঁচে থাকতে চাই নি। অপকর্মে মর্মাহত হয়ে তাই এই বিষাক্ত রক্ত পান করে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু রক্ত পান করার ফলে গৃৎসমদ সঞ্চিত দুগ্ধের প্রভাবে গর্ভবতী হয়ে পরি। লক্ষ্মীরূপে তুই আমার গর্ভে প্রবেশ করিস।"

এই দীর্ঘ কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলেই মন্দোদরী চুপ করে গেলেন ।

সীতা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে খুবই ধীরে বললেন, "আমাকে ভ্রূণ অবস্থায় কুরুক্ষেত্রের মাটির তলায় প্রোথিত করে দিলে। রাজা জনক সীতা বলে লালন-পালন করলেন।"

খানিক চুপ থেকে সীতা বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "মা নারীরাই কেন এত ত্যাগ করবেন ? তুমি কেন আমাকে সরিয়ে দিলে তোমার বুক থেকে ? একটুও কাঁপল না হৃদয় ?"

এই তীব্র আঘাত যে আসবে তা জানতেন মন্দোদরী। প্রস্তুত ছিলেন তিনি। আজই শেষ রাত তার জীবনের। যে কথাগুলো এতকাল কাওকে বলতে পারেন নি, আজ সে সময়, সেই ক্ষণ উপস্থিত।

তিনি দু'হাত দিয়ে চোখের জল মুছে বললেন, "হয়তো আমি-তুই নারী বলেই এত দহন। যতবার দগ্ধ হয়েছি ততবার কঠিন হয়েছে সংকল্প। সীতা তুই, রাবণ ও তাঁর বংশের ধ্বংসের কারণ হবি বলে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল। তাই তোর পিতা রাবণের আদেশেই পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম।"

সীতা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, "পিতা কী জানতো না যে আমি তার একমাত্র কন্যা !!"

মন্দোদরী নীরবে মাথা নাড়িয়ে না জানালেন।

তিনি স্থীর ভাবে বললেন, "নাহ ! তিনি কেবল জানতেন তুই জারজ আর তার বংশের মৃত্যুর কারণ হবি, তাই ...। তবে পরে হয়তো অনুমান করেছিলেন। তাই তো তোকে, জগত লক্ষ্মীকে নিয়ে আসে রামের সাথে ছলনা করে ...। তিনি এখন বৃদ্ধ। সেজন্যই হয়তো তোকে কাছ ছাড়া করতে চান না।"

৪

আকাশের পূর্ব কোণ ক্রমে রক্তিম বর্ণ হয়ে উঠছে। দশানন নীরবে বিচরণ করছেন ঘরে। আজ যেন কোনো উদ্বেগ উত্তেজনা নেই। বরং তিনি যেন নিশ্চিত পরিণতির প্রতীক্ষায়। হয়তো তিনি এটাও জানেন সকল কর্মের সকল অন্যায়ের নীরব প্রশ্রয় যেমন তিনি করেছেন ঠিক তেমনই অন্যায়ের সমালোচনা করেছেন তার স্বামীর কাছে একান্তে। মন্দোদরী স্বৈরিণী যে নন তা তিন লোকের সকলেই অবহিত।

লঙ্কার কাননে সবে দুয়েকটা পাখী ডেকে উঠেছে। সমুদ্রতটে দশানন স্ত্রীর হাতের উপর হাত রেখে বললেন, "আমি জানি তোমার মনে অসংখ্য প্রশ্ন। কিন্তু সময় কোথায় সকলের উত্তর দেওয়ার। তাও যুদ্ধে যাওয়ার আগে বলি, এটাই আমার অন্তিম যাত্রা। আর হয়তো দেখা হবে না।"

মন্দোদরী আঁতকে উঠলেন। তিরতির করে কেঁপে উঠলো তার দুই ঠোঁট। একে একে তিন পুত্র অতিকায়, অক্ষয়কুর্মা, ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর এই বিশালাকার পুরী খাঁ খাঁ করছে। পুত্র-পুত্রবধূদের চিতার আগুন এখনো জ্বলছে। আর এ কী বলছেন বীর দশানন !! বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকেন দশাননের দিকে।

দশানন উদয়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেবী আমি অভিশপ্ত বিজয়। হ্যাঁ, বিষ্ণুভক্ত বিজয়। মনে পড়ে কী বলেছিলেন শুক্রাচার্য? শ্রীরাম বিষ্ণুর অবতার। অভিশপ্ত হয়ে আমি যখন কাতর হয়ে পড়ি তখন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বলেছিলেন, একমাত্র মুক্তির উপায় যখন বিষ্ণুর হাতেই আমার মৃত্যু হবে এ জন্মে। তাই আমি সব জেনেই তোমার কন্যা-পুত্র-অনাচার সকল কিছুই করতে থাকি। আজ সেই ক্ষণ। আমি জানি আজই আমার সেই পুণ্য লগ্ন। আজই যাবো চিরতরে আমার উপাস্য দেবতার বৈকুণ্ঠ ধামে।"

এত বলে রাবণ চুপ করে গেলেন। ঊষা থেকে প্রভাত এখন। বাতাস মৃদুমন্দ ছন্দে বয়ে চলেছে। মন্দোদরী থেমে থেমে বললেন, "স্বামী আমার কী দোষ ছিল ? কেন তুমি স্বার্থপরের মত তোমার সকল কুকর্মের অংশীদার করলে ? এটাই কী বিবাহের তাৎপর্য ? হায় যদি আগে জানতাম ...! আমি কী পেলাম।

মন্দোদরীর স্নিগ্ধ হাহাকারে কঠোর পাষাণ গলে যেমন যায় ঠিক সেদিনও বীর দশানন-দশগ্রীব রাবণের দুই চোখের কোনা সিক্ত হয়ে উঠছিল ।

রাবণ বললেন, "তাই তো তুমি রমনী শ্রেষ্ঠ, তাই তো তুমি নারী। তাই তো তুমি আমার মুক্তির কাণ্ডারি।"

"আমি কী নিয়ে থাকবো প্রভু ?"

"আমার চিতা নিভবে না কোন দিন দেখে নিও। তুমি আজীবন সধবা থাকবে। জানি, এতে তোমার প্রতি সঠিক বিচার হবে না। তবে মন্দোদরী তোমার ত্যাগ-আদর্শ যতদিন এই জগতে থাকবে ততদিন তুমি কোন না কোন ভাবে মানব-দেব-যক্ষ-দানব সকলের কাছে অমর হয়ে থাকবে। তুমিই হবে জগতের দিক পরিচালিকা শক্তি।"

(বাল্মীকি রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ এবং আনন্দ রামায়ণের অনুপ্রেরণায় লিখিত)

---

**পবিত্র চক্রবর্তী** — ৩১শে অক্টোবর ১৯৭৭ সালে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে জন্ম, পড়াশুনা ও বড় হয়ে ওঠা। কবিতা দিয়ে সূচনা সাহিত্য জীবন, তারপর শিশু কিশোর এবং রূপকথার গল্প দিয়ে ভারত ও ভারতের বাইরের দেশে নানা পত্র পত্রিকায় লেখা ; ২০১৪ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ ''প্রেম ও কিছু কথা'' আত্মপ্রকাশ। ২০১৭ সালে ''কাব্য প্রভাকর'' ও ২০১৮ সালে ''কাব্যশ্রী'' উপাধী লাভ। ২০২০ সালে লেখকের কয়েকটি বই কোলকাতা বইমেলায় আসতে চলেছে। ভালোবেসে লেখা শুধু লক্ষ্য ।।

## আলপনা গুহ

# এক্কা দোক্কা

ক্যাঁচ করে উঠলো বাগানের মরচে ধরা গ্রিলের গেটটা ঠেলতেই। গেটের একটা পাল্লার নীচের দিকটা খানিকটা মাটিতে বসেও গেছে। বেশ খানিকটা ঠেলাঠেলির পর খুলতে পারলো গেটটা অমিতা। কতোদিন বাদে এলো এ বাড়িতে? – প্রায় বছর ঘুরে গেছে তো বটেই। মা চলে যাওয়ার পর আসার আর দরকার তো পড়ে নি। গেট দিয়ে ঢুকেই বাঁ দিকে কাঠ টগরের গাছটা এখনো ফুলে ভরভরন্ত, শরতের সকালের এক পশলা বৃষ্টিতে ভেজা ফুলের গন্ধ জড়িয়ে ধরলো অমিতাকে। টুপ করে মাটি থেকে একটা ফুল কুড়িয়ে, এলো খোঁপায় গুঁজে নিলো অমিতা, ঠিক আগের মতোই-কলেজ যাবার সময়।

গেট থেকে বাগান পেরিয়ে বাড়ির টানা বারান্দা। ডান দিকে কবিরাজ দাদুর ভেষজ গাছের বাগানে বুনো গাছের জঙ্গল। বারান্দার কোলেই মা-র লাগানো স্থলপদ্মের গাছটা নরম গোলাপি ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে। বারান্দায় উঠে অমিতা পাখি কে বললো-তুই চট করে পেছনের বাগান থেকে কয়েকটা কাগজি লেবু, আর কচুর শাক তুলে আন তো। দেখিস, পুকুরপাড়ের কাছে যাস না। বেশি দেরি করিস না যেন। আর, একটু বাদে একটা রিকশা ডেকে আনবি গলির মোড় থেকে।

পাখি একটুও দেরি না করে ছুট লাগালো খিড়কির দরজার দিকে, পেছনের বাগানে ডাঁশা পেয়ারার গাছ আছে, ও জানে।

টানা বারান্দার একপ্রান্তে মায়ের ঘরের দরজাটা আলতো করে ঠেলতেই খুলে গেলো। দামী কিছুই তো নেই এ বাড়িতে, তাই তালাচাবির ঝকমারিও নেই। পুরনো ভারী কাঠের আসবাবগুলোর কিছু অমিতা নিয়েছে, ভাইয়েরা নিতে চাইলো না, ওদের ফ্ল্যাটে বেমানান, তাছাড়া জায়গা নেই। বাকি গেছে কাঠের গুদামে।এবার তো বাড়িটাও বিক্রি হয়ে গেছে। সামনের শুক্রবারই বাড়ি ভাঙ্গা শুরু হবে। অমিতা আজ এসেছে কিছু পড়ে রইলো কিনা দেখে নিতে।

ফলসা রঙা ধনেখালির আঁচল কোমরে গুঁজে ঘরে ঢুকলো অমিতা। লাল সিমেন্টের মেঝেতে হালকা ধুলোর আস্তরণ। জানলার কাঁচের শার্সি বেয়ে আসা রোদের ছায়ায় মেঝেতে লম্বা গরাদের আঁকিবুঁকি।

জানলার উল্টোদিকে একটা উঁচু চৌকি শুধু রয়ে গেছে। মায়ের যখন খুব শরীর খারাপ, পাখির মা সুমতি, মা-কে দেখাশুনো করতো, সুমতিই রাতের বেলা শুতো ওই চৌকিতে। চৌকির নীচে একটা বেশ বড়সড় লোহার ট্রাঙ্ক। আগের বার খেয়াল করে নি তো। নীচু হয়ে ট্রাঙ্কের আংটা ধরে টান দিলো, নাঃ – বেশ ভারী। ইসসস, পাখিটাকে বাগানে না পাঠালেই হতো। টানাটানি করতে গিয়ে কোমরে খিঁচ না লাগে। শরীরও তো এখন অনেকটাই ভারী।

একটু হাঁসফাঁস করে মেঝেতে থেবড়ে বসে ট্রাঙ্কটা টেনে বের করলো ভাগ্যিস কোনো তালা লাগানো নেই ।

সাবধানে ভারী ডালাটা তুলে ধরে অমিতা। খান পাঁচেক পুরোনো সুতির শাড়ি-মনে হয় বাসন কেনার জন্য রাখা, কিছু কালো হয়ে যাওয়া পেতলের থালা-বাটি-গ্লাস, দুটো প্রমাণ সাইজের নক্সি কাঁথা, লাল শালুর ঝালর দেওয়া লাল-হলুদ-সবুজ বরফি নকশাতোলা একটা আসন, একটা অর্ধেক বোনা নেভি ব্লু সোয়েটার, সাথে উল আর কাঁটা, বেশ কিছু পুরনো ম্যাগাজিন-প্রসাদ, উলটোরথ, আনন্দলোক, দেশ, আর চকচকে উজ্জ্বল কাগজের সোভিয়েত নারী। অমিতা সবকিছু বের করে তোরঙ্গের পাশে মেঝেতে ডাঁই করে রাখতে থাকে। একদম নীচে একটা টিনের ছোটো সুটকেস। আরে – এটা তো অমিতা ছোটোবেলা ইস্কুলে নিয়ে যেতো-সেই শিশুনিকেতন থেকে গভর্মেন্ট গার্লস স্কুলে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত।

চটপট কৌতুহলী আঙ্গুলে সুটকেসটা খুলে ফেলে। টুকিটাকি কতো কিছুতে বোঝাই সুটকেসটা। একটা একটা করে বের করতে থাকে অমিতা।

একজোড়া পায়রার ডিমের মতো সাদা বল লাগানো চুলের ব্যান্ড, ল্যাবেন্টোকিও। পুজোর সময় শ্যাম্পু করা ফুরফুরে কোঁকড়া চুলে দুটো ঝুঁটিতে ল্যাবেন্টোকিও লাগিয়ে ঠাকুর দেখতে যেতো অমিতারা। অনেক পরে জেনেছে লাভ ইন টোকিও ছবিতে নাকি আশা পারেখ ওমনি ব্যান্ড বেঁধেছিলো চুলে। ছোটোদের মুখে নামটা ল্যাবেন্টোকিও হয়ে গিয়েছিলো। ফিক করে হেসে ফেলে অমিতা।

হলদে ঝাপসা হয়ে আসা সাদা কালো একটা ছবি। ইসস, চশমাটা যে কেন আনে নি, চোখের কাছে নিয়ে আসে পুরনো ছবিটা। ইস্কুলের মাঠে বকুলগাছের নীচে শাড়ি পরা, দুই বিনুনি, হর্সটেইল আর এক বিনুনির মেয়েরা সব। এটা তো ক্লাস টেনের ছবি-মাধ্যমিক পরীক্ষার ঠিক আগে আগেই তোলা। সময়ের পলি পড়েছে অমিতার – চোখের কোণায় বয়সচিহ্নে, চুলে রূপোলি সুতোর ঝিলিকে, ঈষৎ পৃথুল দেহের ভারে। সাথে আছে হাঁটুর ব্যথা, চোখের চালসে, রক্তে শর্করা আর ক্লান্ত সংসারী এক মন। এক ঝাঁক কিশোরী সময়ের চিক সরিয়ে তাকিয়ে আছে অমিতার দিকে – ওই তো মাটিতে বসে আছে পর্ণা, অমিতা, ঝিনুক, অনিন্দিতা, সাহানা, পৌষালি, মৌমিতা, মধুশ্রী। পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে রূপসা, সোমদত্তা, পিউ, অনামিকা, কাজরী, শুচিস্মিতা, বৈশালী, টুম্পা, বিদিশা – সব্বাইকে চিনতে পারছে এতো গুলো বছর পেরিয়েও – মোট তিরিশজন – গুনে দেখলো অমিতা – সবাই ওর ক্লাসের – সেই ক্লাস থ্রি থেকে।

অমিতা আলতো হাতে নামিয়ে রাখলো ছবিটা একপাশে।

দু পাতা জোড়া রবিবারের খবরের কাগজের বিজ্ঞাপণ – পুজোয় চাই নতুন জুতো – সারি সারি মেয়েদের জুতোর ছবি – মারি ক্লেয়ার, ফিয়োনা, ব্যালেরিনা, মনিকা, ডোরা – কি সুন্দর সুন্দর বাটার জুতোর নাম। ছোটো ব্লক হিল, প্ল্যাটফর্ম হিল, বাহারি স্ট্র্যাপের চটি – পুজোর ঠিক এক সপ্তাহ আগে দিনবাজারে বাটার দোকানে বাবার সাথে পুজোর জুতো কিনতে যাওয়া – রাতের বেলা বালিশের পাশে জুতোর বাক্স রেখে ঘুমোনো,সক্কাল বেলা ঘুম থেকে উঠে ফিনফিনে কাগজের আস্তরণ সরিয়ে একবার দেখে নেওয়া চকচকে জুতোর পালিশ। মা কতোবার বলেছে জুতো পরে আগে পা সইয়ে নিতে – কিন্তু নতুন জামার সাথে কী করে পুরনো জুতো পরবে ? তাই নতুন হিল জুতোর ফোস্কা নিয়েই ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ঠাকুর দেখা। বাড়ি ফিরে টুসটুসে ফোস্কায় বার্নল লাগিয়ে দিতো বাবা।

গোলাপি ক্রেপ কাগজের ঘাগরা পরা, আকাশি কাঁচুলিতে রঙ্গিন চুমকি বসানো তুহিনা পুতুল। ক্লাস ফোর-এ জয়ন্তীদির হাতের কাজের ক্লাসে অমিতার শিল্পকর্ম। ছুটির দিন শীতের দুপুরে স্নান সেরে ভেতর বারান্দায় – বেতের মোড়ায় রোদে পিঠ দিয়ে ভেজা এলো চুল মেলে বসে আছে মা, হাতে তুহিনার শিশি। অমিতা পুতুল হাতে করে চোখ বুজে তুহিনার মসৃণ শুভ্র শীতল স্পর্শ আর হালকা শীতের গন্ধ অনুভব করে যেন।

পন্ডস ক্রিমের একটা কৌটো প্লাস্টিকের না – চিনেমাটির। কৌটোর মুখ খুলতেই ফিকে সুবাস নাকে এসে লাগলো অমিতার। কৌটোর ভেতর টুকটুকে লাল চন্দনবীচি। ইস্কুলের গেট দিয়ে ঢুকে ইস্কুলবাড়ি যাওয়ার রাস্তায় বাঁ দিকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা রাধাচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, সোনাঝুরি গাছেরা মেয়েদের যাবার পথে ছড়িয়ে রাখে একরাশ ফুল। শেষ বসন্তে ফুলের পালা শেষ হলে সোনাঝুরি থেকে ঝুলতো সারি সারি বাঁদরলাঠি। সেই বাঁদরলাঠি যখন শুকিয়ে ঝুনো হয়ে মাটিতে ঝরে পড়তো, অমিতারা সেই শুকনো বাঁদরলাঠি থেকে বের করে নিত লাল টুকটুকে চন্দনবীচি, অতি যত্নে জমিয়ে রাখতো সেই অমূল্য সম্পদ পেন্সিল বক্সে, টিফিন কৌটোয়।

একটা ইংরিজি হাতের লেখার খাতা। গরমের ছুটিতে ঝিমঝিম দুপুরে উঠোনে আম গাছের ছায়ায় বসে মৌমিতা আর অমিতা ছুটির কাজ শেষ করছে তাড়াতাড়ি। সোজা সোজা গোল গোল ইংরিজি ছোটো হাতের বড়ো হাতের পি, ডি, কিউ যত্ন করে লিখতে হবে, নইলে অনুভাদি নির্ঘাৎ ছুটির পর রেখে দেবে যতোক্ষণ না সোজা সোজা গোল গোল লেখা হচ্ছে। আর পরীক্ষার খাতার সেই ভয়ানক নম্বর !!! ১০ এর মধ্যে ৬ ২/৫, ৭ ১/৪ ইত্যাদি। ইংরিজির ক্লাস – পরীক্ষার নম্বর যোগ করতে গিয়ে ভগ্নাংশ যোগের অংক কষা।

পাশের পাড়ায় মৌমিতার বাড়ি। একসাথে পড়াশুনোর মহৎ প্রয়াস – না আড্ডা মারার অছিলা বোঝা মুস্কিল। কখন চারটা বাজবে – গলির মোড়ে মণিদা দিবানিদ্রা সেরে আচারের দোকানটা খুললেই খবরের কাগজের পাতায় তেঁতুলের আচার চাটতে চাটতে মৌমিতাকে পাশের পাড়ার বাড়িতে এগিয়ে দিতে দিতে বিকেল গড়িয়ে কখন সন্ধেবেলার শাঁখ বেজে ওঠে।

একগুচ্ছ নববর্ষের কার্ড-ডালে ডালে ফুল ফুটেছে/নববর্ষের ডাক উঠেছে/তুমি আমার বন্ধু হও/নববর্ষের কার্ড লও। ড্রইং খাতার পাতা ছিঁড়ে – পাতলা আর্টপেপারে ক্যামলিনের রঙ্গিন পেন্সিল, মোমরং, প্যাস্টেলের আঁকিবুঁকির শিল্প সব।

ঘিয়ে রঙের পুরু দামী কাগজের মলাট দেওয়া ডাকটিকিটের খাতা আর একগোছা লেনিনগ্রাডের পিকচার পোস্টকার্ড-অমিতার ছোটো মামার পাঠানো রাশিয়া – তখনকার সোভিয়েত রাশিয়া থেকে। কি সুন্দর সব ছবি – রঙ্গিন ফুলের কেয়ারি করা ঝকঝকে রাস্তা, পার্ক, ফোয়ারা, প্রাসাদের মতো সব বাড়ি – ছোটোবেলায় ওই সব ছবি দেখে দেখে অমিতা বিদেশী সেই সব শহরে মনে মনে কতবার বেড়াতে গিয়েছে।

খাতা, কার্ড, কাগজপত্রের নীচে একটা চৌকো টিনের বাক্স। চকোলেটের বাক্স। কালো রঙের ঢাকনার ওপর সোনালি-রূপুলি আরো কতো রঙের উজ্জ্বল রেখায় আঁকা-ছিমছাম সাজানো জাপানি বাগানে, প্যাগোডার দিকে যেতে যেতে ছাতা মাথায়, কিমোনো পরা জাপানি মেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে অমিতার দিকে তাকিয়ে আছে। বাক্সটা বের করে আনলো অমিতা।

ঢাকনা খুলে দেখতে পেলো নানা রঙের রোঁয়া রোঁয়া পশমের একটা চ্যাপটা বল। ইস্কুলে তখনো শীতের ইউনিফর্ম চালু হয় নি। ইচ্ছেমতো রঙ আর ডিজাইনের সোয়েটার পরে ইস্কুলে যেতো অমিতারা। বন্ধুদের নরম নরম ওমে ভরা সুন্দর সুন্দর সব রঙ্গিন সোয়েটার থেকে টুকিয়ে টুকিয়ে তুলে নিতো এক চিমটি উজ্জ্বল পশমের রোঁয়া। সেই রংমিশালী উলের বল পেন্সিল বাক্সের কোণায় আদুরে বেড়ালের মতো ঠাঁই নিতো। অমিতার মনে পড়ে গেলো নিবেদিতার একটা গলাবন্ধ নীল সোয়েটার ছিলো, কোমরের কাছে সাদা হরিণের সারি। আর ঋতুপর্ণার হালকা হলুদ-বাদামী-হালকা সবুজ শেডের সোয়েটার-কাঁধের কাছে টিপ বোতাম দিয়ে আটকানো।

দুটো পুতুলের শাড়ি। মা-কাকিমার কাছে কতো ঘ্যানঘ্যান করে আদায় করা – পুরনো শাড়ি কেটে পুতুলের বাহারি শাড়ি। একটা গোলাপি-সাদা ববি প্রিন্টের আর একটা গাঢ় সবুজ-খয়েরি-কালো জংলা ছাপা। ইস্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় ভাস্বতী আর অমিতা কলেজ ফেরত দিদি আর দিদিমনিদের বাহারি শাড়ি দেখে ভাবতো-ইসসস এটা যদি আমার পুতুলের শাড়ি হতো ! সেই শাড়ি পছন্দ নিয়ে কতো ঝগড়া, মুখভার, দু-দিনের আড়ি।

কচি কলাপাতা রঙের টিনের গোল টিফিন কৌটো-হাতে নিয়ে দেখলো অমিতা, ভেতরে কি যেন ঝুনঝুন করছে-অমিতা একটু কসরত করে চেপে বসা ঢাকনাটা খুলে ফেললো। জানলা বেয়ে আসা সকালের রোদ্দুরে ঝিকমিক করে ওঠে একরাশ পুঁতি – লাল, সবুজ, গাঢ় নীল, আসমানী নীল, কমলা, হলুদ, বেগুনি, সাদা, সোনালি-রূপুলি কত্তো রকম রং – গোল, লম্বাটে, চৌকো ডিমের মতো – কতো রকমের পুঁতি। বন্দনার সাত রাজার ধন এক মানিক – পুঁতির কৌটো। পূর্ব-পাকিস্থান থেকে বন্দনারা সপরিবারে থাকতে এসেছিলো ওদের আত্মীয় – পাশের বাড়ির অবনী জেঠুর বাড়িতে। সেই যখন ৭১ সালে বড় রাস্তা দিয়ে ভারী যুদ্ধের ট্যাঙ্ক গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যেত সীমান্তের দিকে – বড় পুকুরপাড়ে পাড়ার ছেলেদের হাই স্কুলে মিলিটারি জওয়ানদের আস্তানা-সন্ধেবেলা লণ্ঠনের টিমটিমে হলুদ আলো কালো কাগজের ঘেরাটোপ ভেদ করে দেওয়ালে ভুতুড়ে ছায়া ফেলে – শীতের রাতে লেপের ওমে যখন বটের আঁঠার মতো ঘুম নেমে আসে চোখের পাতায় – দূরে চিলাহাটির সীমান্ত থেকে ভেসে আসে আবছা বন্দুকের শব্দ। কখনো কোনো কোনো রাতে সাইরেন বেজে ওঠে – বোমারু বিমানের গোঁ গোঁ শব্দ বাগান ঘেরা বাড়ির মাথার ওপর দিয়ে যেতে যেতে দূরে মিলিয়ে যায়। বাবা সুতির মশারির ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে মেঝেতে রাখা লণ্ঠনটা নিভিয়ে দেন। সেই সময় সকাল হতেই বড় রাস্তা বেয়ে ঢল নামে মানুষের – মাথায় পুটুঁলি, বগলে বোঁচকা, হাতে টিনের ট্রাঙ্ক, কোলে শিশু – যুদ্ধ থেকে পালানো আশ্রয়ের খোঁজে মানুষের মিছিল – জয় বাংলা।

অমিতার থেকে বছর দুয়েকের বড়ো, মুখে ছিট ছিট মেছেতার দাগওয়ালা বন্দনার সাথে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিলো অমিতার। ইস্কুলে যেত না বন্দনা, সারাদিন বাড়ি বসে পুতুলখেলা-খুব হিংসে হতো – সদ্য ইস্কুলে যেতে শুরু করা অমিতার। ইসসসস-কি যে লোভ হতো অমিতার-পুঁতির কৌটোটার ওপর। তিনটে নাইলনের পুতুল, কোডাক ফিল্মের এক কৌটো ভর্তি চন্দনবীচি, চারটে সুন্দর সুন্দর ছাপা পুতুলের শাড়ি আর বারান্দায় রোদে বসানো মা-র আচারের বয়াম থেকে এক খামচা জলপাইয়ের আচার ঘুষ দিয়েও বন্দনার থেকে পুঁতির কৌটো একদিনের জন্য ও নিজের কাছে রাখতে পারেনি অমিতা। রোজদিন সন্ধেবেলা খেলার শেষে বন্দনা কৌটোটা টুপ করে জামার কোঁচড়ে লুকিয়ে ফেলে বাড়ির দিকে হাঁটা দিতো।

তারপর অমিতা একদিন ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরে দেখে বন্দনারা চলে গেছে-ফিরে গেছে নিজেদের নতুন দেশ বাংলাদেশে। মা-র কাছে রেখে গেছে সাত রাজার ধন এক মানিক-পুঁতির কৌটোটা।

কুচকুচে কালো তিনকোনাচে পাতলা একটুকরো পাথর। এক্কা দোক্কা আর কিতকিত খেলার গুটি। ইস্কুলে তাড়াতাড়ি পৌঁছেই এক্কা দোক্কা আর কিতকিতের কোট দখল। কলপাড়েরটা সবচেয়ে ভালো একনম্বর, লিচুগাছের তলারটা অতোটা ভালো না, ধুলোভরা। কোনো এক মহালয়ার ভোরে পাড়ার ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে তিস্তার পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়েছিল জুবিলি পার্কের নীচেই তিস্তার চরে। শিরশিরে ভোরের হাওয়ায় লুটোপুটি খাওয়া ধবধবে কাশবনে লুকোচুরি খেলার সময় পাথরটা কুড়িয়ে পেয়েছিলো অমিতা।

শ্যাওলা সবুজ রঙের ছোট্ট ভারী কাঁচের একটা শিশি, ছোট্ট সাদা একটা গোল বল দিয়ে মুখ আঁটা। কস্তুরির খুব হালকা সুবাস নাকে এসে লাগে অমিতার।

ছোটোকাকু এনে দিয়েছিলো পুজোর সময়। অমিতা গল্পের বইতে পড়েছিলো – বরফ ঢাকা পাহাড়ে কস্তুরী মৃগ পাগল হয়ে ছুটে বেড়ায় মৃগনাভির গন্ধে।

শরতের শুরুতেই দূরের পাহাড় থেকে নেমে আসে কাবুলিওয়ালা, কাশ্মিরী ফিরিওয়ালারা সওদা নিয়ে-ছোটো মফস্বল শহরের অফিস-কাছারিতে, ইস্কুলে-কলেজে। কাবুলিওয়ালা ছোটোকাকুকে বলেছিলো একটুকরো তুলো একটুখানি কস্তুরী আতরে ভিজিয়ে পোষাকের ভেতরে, কানের পেছনে রাখতে হয়। অমিতার কি আর তর সয় ? মোলায়েম গোলাপি রঙের জুলি হাতা পুজোর জামার ঠিক বুকের কাছে উপুড় করে দিয়েছিলো আতরের শিশি। গাঢ় সবুজ আতরের টিপ রয়ে গেলো অমিতার সাধের জামায়।

টিনের বাক্সের একেবারে নীচে ভাঁজ করা একটা কাগজ। ইস্কুল থেকে ফেরার পথে লাল পাড় সাদা শাড়ি, বুকের ওপর লুটোনো দুই বিনুনি – কিশোরী অমিতার পায়ের কাছে টুপ করে এসে পড়েছিলো রুলটানা কাগজে বেগুনি কালিতে লেখা চিঠি। পাশ দিয়ে সোঁ করে সাইকেল চালিয়ে চলে যায় কাল প্যান্ট আর সাদা জামার তিন কিশোর। যেতে যেতে উস্কোখুস্কো একমাথা কোঁকড়া চুল – সদ্য গোঁফের রেখা ওঠা শ্যামলা এক কিশোর মুখ পিছন ফিরে তাকায়। তারপর থেকে বাড়ির সামনের গলিতে টিং টিং সাইকেলের ঘন্টি শুনতে পেলেই বারান্দায় অকারণ ছুটে আসা – কতদিন – অমিতার আর মনে নেই। আলতো হাতে চিঠিটা ভাঁজ করে বাক্সের ভেতর রাখে অমিতা।

– অমিতা মাসি – কখন থেকে তোমাকে ডাকতেছি, তুমি সাড়াই দ্যাও না। বাসকো কোলে বইসে আছো তো বইসেই আছো। কখন রিশকা ডাইকে আনছি – রিশকাওয়ালা দাঁড়ায় আছে তো। বাড়ি যাইতে হবে না? মেসোর নার্সিং হোমে বাইর হবার টাইম হয়ে গ্যালো – আর তুমি বইসেই আছো – মেসো বকা দিবে কিন্তু।

ডুব ডুব অতল জলের তলা থেকে যেন উঠে আসে অমিতা। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে – দরজার ফ্রেমে উমনো ঝুমনো পাখি জামার কোঁচড় ভরে ডাঁশা পেয়ারা, কাগজি লেবু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে এক গোছা কচুর শাক। আস্তে করে

কালো চকোলেটের বাক্সটা টিনের সুটকেসের ভেতর রেখে সুটকেসটা ধীরে ধীরে বন্ধ করে অমিতা।

– যা, রিক্সাওয়ালাকে ডেকে আন, ট্রাঙ্কটা তুলে দিক রিক্সায়। আর শোন, এদিকে আয়।

পায়ে পায়ে ঘরে ঢোকে পাখি। অমিতা টিনের সুটকেসটা পাখির দিকে বাড়িয়ে দেয়।

– নে, এই বাক্সটা তোকে দিলাম। কোঁচড়ের জিনিসগুলো রিক্সায় রেখে বাক্সটা নিয়ে যা। যত্ন করে রাখবি। অনেক সুন্দর সুন্দর পুঁতি আছে, পুতুলের গয়না বানাস।

মেঝেতে বাঁ হাতের ভর দিয়ে অমিতা উঠে দাঁড়ায়। নাঃ হাঁটু দুটো বড্ড জ্বালাচ্ছে।

রিক্সাওয়ালা আর পাখি লোহার ট্রাঙ্ক, টিনের সুটকেস, কাগজি লেবু, পেয়ারা, কচুর শাক নিয়ে চলে গেছে। অমিতা আর একবার ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে দেখে। চৌকির তলায় লাল মেঝেতে পাতলা ধুলোর আস্তরণের ওপর ট্রাঙ্কের ছাপটা রয়ে গেছে। অমিতা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে আস্তে করে দরজাটা টেনে দেয়।

---

**আলপনা গুহ** – কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের বাংলা অনার্সের স্নাতক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, দিল্লির Alliance Francaise থেকে ফরাসি ভাষায় ডিপ্লোমা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হোম পলিটিক্যাল বিভাগে বাংলা অনুবাদক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। নানা দেশ বিদেশ ঘুরে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় পার্থের বাসিন্দা, এখানেও তিনি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুবাদকের কাজ করছেন।

# তপনজ্যোতি মিত্র

## উপত্যকার গল্প

যেমন করে অন্যদিনগুলো আসে, আজকের দিনও সেইভাবে এল – বর্ণহীন, মন্থর, কোন উত্থানপতন ছাড়াই।

কোথাও যেন কোনো ভালবাসা রইলো না।

রইলো না ?

না।

কোথাও যেন কোনো ফুল ফুটল না।

ফুটল না ?

না।

কোথাও যেন কোনও আকাশে একটুকরো মেঘ এল না।

এল না ?

না।

কার জীবনে এরকম ঘটনা ঘটে ?

হীরু বাবুর জীবনে।

হীরুবাবু ? মানে যার ভাল নাম হীরকবাবু ?

যিনি প্রতিদিন নিয়ম করে অফিসে যান,

মাথা গুঁজে কাজ করেন,

কোনো দিন যাকে কাজে ফাঁকি দিতে দেখা যায়নি,

কোনো দিন কোনও প্রলোভন, উৎকোচের লোভ যার হয়নি,

যাকে তাঁর সহকর্মীরা তাঁর কাজে নিষ্ঠার জন্যে, তাঁর সততার জন্যে, তাঁর সরলতার জন্যে ঘৃণা করে ?

ছুটির দিনে কোনো কোনো স্তব্ধ বিকেলের গোধূলি বেলার বিষণ্ণতার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন হীরু বাবু, দেখেন দূরের মাঠ পেরিয়ে কখন ডুবে যাচ্ছে সূর্য। আর মাঠ পেরিয়ে দূরে হেঁটে যাচ্ছে নিঃসঙ্গ এক পথিক।

কোথায় সে যায় ? হীরুবাবু ভাবলেন – ওই পথে তো নিরুদ্দেশের দেশে চলে যাওয়া। এই যাওয়াই কি অন্তিম যাওয়া ?

কোথাও কি লুকিয়ে থাকে হাহাকার ? পাতা ঝরার শব্দ ? অজস্র মেঘবৃষ্টিকণা ?

কখনও কি দুঃখ গভীর, সজল হয় ?

মনে পড়ছে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের স্মৃতি, বাবা মা ভাই বোন স্ত্রী পুত্র কন্যা।

সব ছিল, সব আছে, আবার যেন সব নেই, কুয়াশাঘেরা মাঠের মত যেন ধূসর স্মৃতিরা দাঁড়িয়ে থাকে, আর কোথায় যেন হেঁটে যায় নিঃসঙ্গ এক পথিক।

বইয়ের তাক থেকে একটি পুরোনো দিনের বই নামিয়ে পড়ার আনন্দ অনুভুতি কি সব দুঃখকে ম্লান করে ?

আজ একটি বই পড়তে পড়তে হীরুবাবু ভাবলেন।

আজই কি পূর্ণতা এল জীবনে? আজই কি চলে যাওয়ার দিন, দূর দেশে, অমৃত এক তীর্থযাত্রায়?

খুব শান্তভাবে অফিসে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন হীরুবাবু।

শুনতে পেলেন তাঁকে নিয়ে দৈনন্দিনকার তির্যক মন্তব্যগুলি শুরু হয়েছে।

তিনি কাজের ফাঁকে শান্তভাবে চিঠিটি লিখলেন, তারপর একসময় উঠে গিয়ে ম্যানেজার অবনীবাবুর ঘরে দিয়ে এলেন।

বাইরের আকাশে বাতাসে মাঠে বাগানে উন্মুক্ত পাখিরা খেলা করছিল, দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল তাদের ডাক, গাছেদের ডালে ডালে বসন্ত উৎসবের ফুলগুলি ফুটে থাকছিল, আলোকমালার মত।

একটু পরে অবনীবাবুর ঘরে ডাক পড়ল। হীরুবাবু সেখানে গিয়ে দেখলেন – রতনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

রতন কি তাঁকে কোনদিন মানুষের মর্যাদা দিয়েছিল? কোনদিন কি একটু সম্মান মেশানো গলায় কথা বলেছিল? কোনদিন কি একটু শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিল?

করে নি।

যাইহোক আজ হীরুবাবু এসবের উর্ধে, তিনি ক্ষমাসুন্দর হয়ে আছেন আজকের দিনে, কোনও অন্ধকারই আজ আর তাঁকে স্পর্শ করছে না।

অবনীবাবু রতনকে বললেন – রতন, হীরুবাবু চলে যাচ্ছেন, তোমার সুবিধেই হল, তুমি বলেছ ওর জন্যে তুমি কোনও কাজ করতে পারো না, এখন থেকে পারবে।

অবনী হাত নেড়ে হীরুবাবুকে ঘর থেকে চলে যেতে বললেন, চলে আসার সময় হীরুবাবু শুনতে পেলেন রতন অবনীকে বলছে – স্যার ওই লোকটাকে কাজ ছেড়ে যেতে দেবেন না।

অবনী আশ্চর্য হয়ে বললেন – কেন রতন ?

রতন – সব কাজ ওই হীরুবাবুই করেন স্যার।

অবনী আরো আশ্চর্য হয়ে গেলেন – মানে ? তাহলে তুমি কি কর রতন ?

আমি শুধু সই করি স্যার।

অবনী ঘৃণাভরে রতনের দিকে তাকালেন – এতদিন ওনার নামে বলে এসেছ। তাহলে তো তোমার মাইনের সব টাকা হীরুবাবুর পাওয়ার কথা।

রতন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

উতল হওয়া এসে বলে আর কত দেরি ?

নীলাকাশ বলে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি বন্ধু,

প্রিয় নদীর তীর বলে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থেকো কিছুকাল।

অফিস ছুটির সময় হল।

হীরুবাবু উঠলেন, একবার নিজের টেবিলের দিকে তাকালেন, কিছুই নিয়ে যাবার নেই।

এতদিনের কাজের জায়গা ছেড়ে যাওয়ার একটু বেদনা কি বুকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে? – পাহাড়ের গায়ে আটকে থাকা একটুকরো বর্ষার মেঘের মতন, তারপর কখন বৃষ্টি হয়ে নামবে।

সারা অফিস জেনে গেছে হীরুবাবু আজ চলে যাচ্ছেন।

মিথ্যাবাদী, পরশ্রীকাতর, নীচুমনের মানুষগুলো বসে আছে পরাজিত সৈনিকের মত, তাদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন হীরুবাবু মাথা উঁচু করে।

বেরিয়ে যাওয়ার মূহুর্তে ওনার ঘর থেকে বেরিয়ে অবনীবাবু ডাকলেন – হীরুবাবু একবার আমার ঘরে আসবেন ?

হীরুবাবু ? যে লোকটা চিরকাল তাকে ছোট করে এসেছে, কথায় কথায় অপমান করেছে – সকলের কাছ থেকে মিথ্যাচারগুলো শুনে, কোনদিন যে সত্যতা যাচাই করেনি, সে আজ ডাকছে সম্মান দিয়ে !

ঘরে অবনীবাবু হীরুবাবুর হাত জড়িয়ে ধরলেন – হীরুবাবু, আমি দুঃখিত, লজ্জিত, ক্ষমাপ্রার্থী, আমারই ভুল হয়েছিল।

হীরুবাবু নিরুত্তর থাকলেন।

অবনী একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলেন হীরুবাবুর দিকে – জানি এসবের কোনও মূল্য নেই আপনার কাছে, তবু আপনার কাজের পুরস্কার হিসেবে সামান্য কিছু। আর যদি আবার কখনও কাজে ফিরে আসতে চান তাহলে আপনার জন্যে অফিসের দরজা সবসময় খোলা রইল।

হীরুবাবু অবনীবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন – আমার কোনও কিছু প্রযোজন নেই অবনীবাবু, এটি কোনও সমাজসেবী সংস্থাকে দিয়ে দেবেন।

অফিসের দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার আগে হীরুবাবু একবার শেষবারের মতন পিছন ফিরে তাকালেন বহুদিনের কাজের ঘরটির দিকে।

তোমাদের জন্যে রইল খোলা জীবন,

তোমাদের জন্যে রইল নীলাঞ্জন নীলাকাশ,

তোমাদের জন্যে রইল অপরূপ সুন্দর এক পৃথিবী, মায়াময় জগত,

তোমরা ঠিক কর সেখানে তোমরা পৌঁছতে চাও কি না।

একটি পাহাড়ের নির্জনতম রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন হীরুবাবু, দেখলেন রাস্তার দুধারে দুটি উপত্যকা – একদিকে বিশ্বাসহীনতার আর এক দিকে বিশ্বাসের। বিশ্বাসের উপত্যকায় ফুটে আছে অজস্র ফুল, আর আছে অনেক অমল শিশুরা যাদের কাছে জীবন এখনো সম্ভাবনাময়, তারা যেন দূর থেকে হাত নাড়ছিল।

ওদের কাছেই তো যাব, ওই শিশুগুলির লেখাপড়া, দেখাশুনো, খেলাধূলার দায়িত্ব নেব।

হীরকবাবু বিশ্বাসের উপত্যকার দিকে এগোলেন।

---

**তপনজ্যোতি মিত্র** – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি.। কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান। রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু-এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস। একটি গল্প 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি' দখিনা পত্রিকায় প্রকাশিত। কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্প করতে ভালবাসেন। এবং কখনো নাটকে অভিনয়, কখনো বা দেশ ভ্রমণ।

# ইন্দিরা চন্দ

## ত্রয়ী

১

মাঝরাতে যখন বৃষ্টি নামে তখন রামধনু গুলো এসে ল্যাম্পপোস্টের গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমায়। বিদ্যুৎ চমকালে তারা লুকিয়ে পড়ে, বাজের আওয়াজ বন্ধ হলে আবার নিশ্চিন্তে ফিরে এসে হাওয়ার তালে তালে পা দোলায়। টিমটিমে আলো মিটি মিটি হাসি হেসে মজা দেখে, ছোট্ট ভীতু রামধনুটার কপালে আলতো চুমু দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে, সারা রাত জেগে পাহারা দেয়। সকাল হলে সূর্যের হাতে রামধনুকে সাবধানে সঁপে দিয়ে বাড়ি ফেরে। যখন মেঘের আড়াল থেকে ঝকঝকে রামধনু নীল আকাশ এপার ওপার করে তখন যদি ঘুমন্ত ল্যাম্প পোস্টের দিকে তাকিয়ে দেখো, দেখবে তার ঠোঁটে সেই হাসি . . . যেমন ছিল সেই বাদলা রাতে . . .

২

সাদা পাতাটা কিছুতেই হাওয়ার সাথে পেরে ওঠে না। খাতা থেকে যখন ছিঁড়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল দিদিমনি, তখন মন খারাপ করে বসে ছিল চুপ করে ঐ গাছের তলায়, একলা . . . হঠাৎ পিছন থেকে এক চাপড় পড়ল পিঠে, পিছন ফিরে দেখবার আগেই একেবারে রাস্তার ধারে, শুধু অট্টহাসি শুনে বুঝলো এ আর কেউ হতে পারে না ঐ হাওয়া ছাড়া। সময় অসময়ের কোন জ্ঞান নেই, বড় ছোট কোন মান নেই, শুধুই অর্থহীন হুল্লোড় . . . বিরক্ত পাতা তাড়াতাড়ি রাস্তা পার করে চলে যেতে চাইলো . . . পা বাড়িয়েছে আর হুস্ করে এক গাড়ী, হাওয়াও হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান . . . ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল পৃষ্ঠা। হাওয়া হাত ধরে গাড়ী বাঁচিয়ে রাস্তা পার করে মাঠে ঘুড়ির সাথে আলাপ করালো। কত রঙ, কত বাহার তবে সুতো বাঁধা, নিজের ইচ্ছে মতো উড়তে পারছে কই? হাওয়া নিয়ে গেল মাঠের কোণে গাছের ছায়ায় . . . বসে জিরোচ্ছিলো সাদা পাতা তখন ঐ মেয়েটা হাতে তুলে কয়েকটা সংখ্যা লিখে ছেলেটাকে দিল . . . আর সাদা পাতা চলে গেল জামার বুক পকেটে . . . লেখা পাতার কানে আসে মাদলের দ্রিমিতা দ্রিমি, কোন অজানা বাঁশীর সুরের সাথে সে তাল মেলাচ্ছে . . .

৩

মাধবীলতার আজ অভিমান হয়েছে। রোজ প্রজাপতিরা এসে কত গল্প করে আজ সবাই শুধু গোলাপের কানে কানে কথা বলছে। গোলাপ হেসে, মাথা নেড়ে সব রঙ, গন্ধ ছড়িয়ে দিচ্ছে। "ঢং !" পেয়ারা গাছের ডাল বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে মাধবীলতা বলে উঠল। পেয়ারা গাছ তার খসখসে পাতা নেড়ে হেসে ফেলে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, " রাগ করিস না মাধবী, এ তো দুদিনের বৈরাগী, একে একে সবাই চলে যাবে ঝুঁড়ি মধ্যে, তারপর তাদের হদিশ পাওয়া মুশকিল, তুই আর আমি থাকবো এই পীর বাবার কবর আগলে"। মাধবীলতার খুব ইচ্ছে হয় ঐ মালির ঝুঁড়িতে চেপে বাজারে যেতে, তারপর কারো ফুলদানি বা কারো গলার মালা হতে। সে ভেবে পায়না তার কি দোষ, কেন সে পারে না এ সব করতে . . . রজনীগন্ধা, জুঁই, বেল এমনকি গাঁদা ও মালা হয়ে দোলে তবে সে কেন একঘরে? তার রূপ, তার সুবাস সবই বুঝি বৃথা। তার চোখ ফেটে জল আসে, টুপ টুপ করে চোখের জলের মতো ফুল ঝরে পড়তে থাকে, ফুলে ফুলে ঢেকে যায় পীর বাবার সমাধি . . .

---

**ইন্দিরা চন্দ** – শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, 'আমরা যখন সত্যি কারের সংযোগ চাই, আমরা যখন কথা বলি, আমরা ঠিক এমনই কিছু শব্দ খুঁজে নিতে চাই, এমনই কিছু কথা, যা অন্ধের স্পর্শের মতো একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয়। পারিনা হয়তো, কিন্তু খুঁজতে তবু হয়, সবসময়েই খুঁজে যেতে হয় শব্দের সেই অভ্যন্তরীণ স্পর্শ।' ইন্দ্রাণী খুঁজে চলেছেন সেইসবশব্দ । এ'যাবৎ প্রকাশিত দশটি গল্পের সংকলন – "পাড়াতুতোচাঁদ"।

# পারিজাত ব্যানার্জী

## "কলকাতা, তোরেই হৃদয়মাঝে রাখি"

এক টুকরো শহর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছি আমি। যে শহরে আমার বেড়ে ওঠা, তারই পরশ মেখে আমার বহুদিনের আনাগোনা। যেই সময় শহর গ্রামের ভেদাভেদ পর্যন্ত বুঝতাম না, যখন জগৎ বলতে শুধু থাকে মা বাবা আর গোলাপী নীল এক একখানা ঘর, ঠিক সেই সময় থেকেই এক শহরকে চিনি আমি। সেই আজও আমার প্রস্তরবৎ ভিতে জমতে থাকা একান্ত নিজস্ব কলকাতা।

আড়াই বছর বয়সের কি কোনো স্মৃতি থাকে ? থাকলে, ঠিক নথিভুক্ত করে নিতাম সেই ক্ষণ যখন আমার প্রথম এই কলকাতার বুকে আগমন। যেহেতু স্মৃতি এই প্রসঙ্গে বড় অবান্তর, তাই কল্পনাকেই করে নিলাম বরং আমার মনের নিবিড় দোসর।

গোলপার্কের মোড় থেকে দুটো বাঁক ঘুরলেই যেই মস্ত চারতলা বাড়িটা চোখে পড়ে, তারই তিনতলায় চাকরিসূত্রে ভাড়া নিয়ে নতুন বাসা বাঁধলাম আমরা। উত্তর কলকাতার এক সাবেকী পরিবারের বংশোদ্ভূত ছিলেন এই বাড়ির মালিক। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর স্ত্রী তেরোখানি সন্তান লালনপালনের সাথে সাথেই যোগ্য বিচারবলেই হয়ে ওঠেন সর্বৈব কর্ত্রী। আমরা যতদিনে তাঁদের বাড়িতে ভাড়া নিয়ে উঠে গেছি, ততদিনে অবশ্য তাঁর বেশিরভাগ কৃতী সন্তানই দেশের বাইরে। চার ভাই আর এক অবিবাহিত বোনের ভিন্ন হেঁশেলে জড়ানো পেঁচানো করে তবু দালান বরাবর পড়ে থাকতে দেখেছি উত্তর থেকেই উঠে আসা দক্ষিণ কলকাতার এই আলাদা বা ভিন্ন হওয়ার দোটানা।

প্রথমে কি ঘটেছিল জানা নেই, তবে বেশ কিছুদিনের মধ্যেই অন্তত পরিচারিকাদের মাধ্যমে নিশ্চয়ই বুঝেছিল মা বাবা, এ বাড়ির ভাইয়ে ভাইয়ে অন্তত কোনোরকম সদ্ভাব নেই। শুধু যে নেই তা নয়, ভাড়াটেদের সামনে সেই ছিন্ন সম্পর্কের প্রচ্ছন্নভাবে পরিদর্শন ঘটাতেও তাদের কোনো বাধা নেই। প্রায়ই মাঝরাতে চমকে উঠে শুনতাম মাতাল ছোট ভাই অন্যের দরজায় গিয়ে লাথি মারছে, অশ্রাব্য গালিগালাজে ভরে উঠছে বিশাল বিশাল সব সিঁড়ির চৌহদ্দি। পাড়ার লোকজন ডেকে পাঠালে পুলিশ এসে কড়াও নাড়ত দোরগোড়ায়। নেহাত ওই দিদা তখনও বেঁচে, তাই তাঁর দাপটে শেষ অবধি কেউ গ্রেফতার অন্তত হতোনা।

তবে পুজোর মাসে কিভাবে যেন আমূল পরিবর্তিত হয়ে সম্ভ্রান্ত সনাতনী পরিবারের ভেক ধরে নিত হঠাৎ এইসব একই বাড়ির মানুষজন। কপালে চওড়া করে সিঁদুর, নাকে নথ আর গা ভর্তি সোনার গয়না লেপটে বাড়ির সব বউরা হইহই করতে করতে চলে যেত তাদের উত্তরের আদিবাড়িতে। ওই চারদিনের জন্য কিভাবে যেন ছেলেদেরও সামলেসুমলে দিদা নিজেও মা দুর্গার মতো পাড়ি দিতেন নিজের প্রকৃত আলয়ে। গোলপার্কের ওই বাড়িতেই নায়েব বা বাজার সরকার গোছের একজনকেও আমি এই যুগে দাঁড়িয়ে দেখেছি, আজ সে কথা হয়তোবা বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। তিনিই-ই দিদার অবর্তমানে সব সামলাতেন সে কয়েকদিন। তবে ভরসা করে বাড়ির চাবি কখনও কোনোমতে ছেলেদের হাতে কখনও দিতে দেখিনি দিদাকে।

এই দিদার সঙ্গে মনে আছে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতাই ছিল ছোটবেলায়। আমায় দেখতে পেলেই তিনি নানাধরণের মিষ্টি আচার খেতে ডাকতেন। কখনও কখনও আমার নাম করে বাড়িতে পাঠিয়েও দিতেন চিংড়িমাছের বড়া, আমলকির মোরব্বা। ছাদে ঠাকুর ঘর বানিয়েছিলেন খুব সাধ করে, কিন্তু পরের দিকে ঠাকুরমশায়ের হাতেই সব ছেড়ে দিতে হয়েছিল তাঁকে বাতের ব্যথার ভার সামলে আর অত সিঁড়ি ভেঙে বড় একটা উঠতে পারতেন না বলে। মাঝে মাঝে প্রায়ই আক্ষেপ

করতেন, "ইশ, বাড়ি বানানোর সময় যদি বুদ্ধি করে লিফট বসাতাম একটা, তাহলে আমার ঠাকুরকে এত অসুবিধা ভোগ করতে হতো না।"

পরে বুঝেছি, উত্তরের স্মৃতিবিজড়িত আলেখ্যকে মুছে ফেলে তখনও পুরোপুরি আধুনিক হয়ে ওঠেনি আমার শহর। তাই লিফ্টের মতো শহুরে কেতা ওই পুরোনো বাড়ির ভিতে কখনওই মানাতনা কোনোদিন।

মনে আছে, ওই বাড়ির বড় পক্ষের ঘরের দিদির কাছেই আমার প্রথম গান শেখা। বিকেল হলেই তখনও আমাদের পাড়ায় হারমোনিয়াম টেনে গলা সাধতে বসার রেওয়াজটুকু ছিল। সেই সূত্রেই ওই দিদি তার এক বান্ধবীকে রাজি করায় আমায় গান শেখানোর জন্য। নাম যখন অন্য কারও বলিনি আর এই অবেলায়, তখন এই মিষ্টি দিদিমণিটিরও বলা উচিত হবে না। তার কাছে গান কতদূর শিখেছিলাম মনে নেই, তবে এটুকু বলতে পারি, তার আদরের ভাগ পাওয়ার লোভে বিকেল হলেই আমিও লক্ষ্মী মেয়ের মতোই বসে পড়তাম হারমোনিয়ামখানা টেনে।

গানের দিদির বাড়ি ছিল সন্তোষপুরের দিকে। সেই প্রথম আমার সুকান্ত সেতু পেরিয়ে ওই পাড়টায় যাওয়া। বাড়িটা কোথায় ছিল তা মনে নেই একদমই, তবে গোলপার্কের ঝাঁ চকচকে আলো আর ঢাকুরিয়ার সান্ধ্য হইচই পেরোতেই লোডশেডিংয়ে মুখ ঢাকা ঘুটঘুটে হালকা জঙলা অঞ্চলটা যখন চোখের সামনে ঘুম ভেঙে জেগে উঠল হঠাৎ, কল্পনায় মিশে ততক্ষণে সে হয়ে গিয়েছিল অন্য দেশ। আমার কলকাতা অবশ্য জানত তখনই আর একটু পেরোলেই পড়বে পাটুলি – আমার ভবিষ্যতের বিবাহিত জীবনযাপনের ঠিকানা আর আবেশ।

ইতিমধ্যেই স্কুলে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলাম। নার্সারির প্রথম বছরটা মা আমায় নিয়ে নিজেই যাতায়াত করত। সেসময়ের স্কুল সংক্রান্ত তেমন আর কোনো স্মৃতি না থাকলেও বেশ মনে আছে, বিকেল হলেই আমায় আর বাড়িওয়ালার ছোট তরফের আমার সমবয়সী বান্ধবীকে নিয়ে দুই মায়ে মিলে লেকের ধারে বেড়াতে যেত। রবীন্দ্র সরোবরের পাড় বরাবর আজও আমার হাঁটতে খুব ভালো লাগে। শহরের মধ্যে ওই একটিই জায়গা যেখানে এখনও এত গাছপালা, কলকাকলি, নির্ভেজাল বাতাস। যেভাবে রিয়্যাল এস্টেট এজেন্টদের অবশ্য নজর পড়েছে ওদিকেও, সত্যিই জানিনা আর কতদিন আত্মরক্ষা করতে পারবে এই মরূদ্যান।

মায়েরা আমাদের নিয়ে বেশিরভাগ দিনই চলে যেত সাফারি পার্কে। সেখানেই আমার প্রথম দোলনায় চড়া, স্লিপে ওঠা। যেহেতু একই বয়স, বন্ধুত্ব হতে তাই আমাদের দুজনের বেশি সময় লাগল না। সেই প্রথম অনুভব করা, আমরা একবয়সী হলেও ঠিক একরকম কিছুতেই নই। মাতাল অত্যাচারী বাবার প্রভাবে মেয়েটাও কেমন যেন অন্যরকম – জেদী, একগুঁয়ে। ওর মুখেই আমাদের বয়সী কাউকে আমার প্রথম গালিগালাজ করতে শোনা।

যেদিন আমরা বাইরে বেড়াতে যেতাম না, আমি ওর বাড়িতে খেলতে যেতাম চারতলায়। প্রায়ই ছাদেও গিয়েছি সেইসময়। মনে আছে, তখনও হাইরাইজের তেমন চল না থাকায় বেশ স্পষ্ট দেখা যেত দূরের হাওড়া ব্রিজখানাও। এই ছাদের প্রসঙ্গ এলো বলেই আরও দুটো ঘটনা মনে পড়ে গেল এইখানে। এক, আমাদের ঘর থেকে সামনের আর এক বাড়ির ছাদ দেখা যেত। সেইবাড়ির জেঠিমা আমায় জানালায় দেখতে পেলেই অনেক গল্প করতেন। একদিন তাঁর কথাতেই মা আমায় তাঁর মেয়ের নাচের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। আর নাচের বোলে মজে আমি সেই গানের দিদিমণিকে হঠাৎ একদিন বলে বসলাম, "আমি নাচটাই শিখব, গান নয়।"

এর কিছুদিন পরেই অবশ্য জেঠিমার সেই ছাদখানা আমার চোখের আড়ালে চলে যায়। মাঝখানে গজিয়ে ওঠে প্রোমোটারের লোভের অট্টালিকা।

ভাগ্য অন্য গল্পে আশকারা দেওয়ায় নাচটাও পুরো আর শেখা যদিও হয়ে ওঠেনি, তবে আমি আমার মা বাবার কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ, তাঁরা কখনওই জোর করে কিছু আমার উপর অন্তত চাপিয়ে দেননি। কলকাতায় নয়তো কতজনকেই তো দেখলাম – অন্যের ইচ্ছা পূরণ করতেই কাটিয়ে দিল একটা পুরো জন্ম।

যদিও বেশ কিছু বছর পরের, তবু আর একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল এই ছাদের সূত্রেই। সেইসময়ের আমার এক স্কুলের বান্ধবী থাকত গড়িয়াহাটের মোড়ের মাথার এক বাড়ির দোতলায়। গড়িয়াহাট বাজার অঞ্চলের সারাদিনব্যাপী কর্মব্যস্ততার একটা সম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যেত ওর বাড়ির চত্বরে ঢুকতেই। একদিন কি একটা কারণে ছাদে যেতেই হঠাৎ মনে হল ঘাড়ের উপর দিয়ে ধাঁ করে চলে গেল গাড়ি। চমকে পিছিয়ে যাওয়ার আগেই অবশ্য ভ্রমটুকু কেটে গেল। ওর বাড়ির পাশ দিয়েই চলে যাওয়া সদ্য নির্মিত গড়িয়াহাট ফ্লাই-ওভারের সাঁ সাঁ আওয়াজ ততক্ষণে যে কানে একেবারে তালা ধরিয়ে দিয়েছিল।

যাগ্গে, ফিরে যাই বরং আবার আমার সেই ছোটবেলার মায়ামাখানো কলকাতায়। কুসংস্কার সেসময়েও আজকের দিনের মতোই ভালোমতোন প্রকট ছিল নিশ্চয়ই। নয়তো ওইটুকু আমার বাচ্চা শরীর জুড়ে সুঁচ ফোটানোর দাগ ক্রমে জাঁকিয়ে বসতে পারত না। মায়ের প্রথমে চোখে পড়েনি ব্যাপারটা। বা হয়তো ভেবেছিল ছোটদের এইসব খেলাচ্ছলে দুষ্টুমি। পরে কিভাবে যেন জানাজানি হয়ে যায়, আমার সেই চারতলার বান্ধবীর মা তাদের নিজেদের উপর থেকে মাতাল বরের প্রকোপ সরাতে নিজের হাতেই এইসব তুকতাক করছেন।আমার ওই সময়ের আলাদা কোনো স্মৃতি নেই, তবে মায়ের কাছেই শোনা, আমি নাকি প্রায়ই তখন কাঁদতে কাঁদতে বলতাম, "আমি এক, দুই, তিনবার বললাম, আমার গায়ে ওসব ফুটিওনা – কেউ শুনলনা।"

শেষের দিকে ঘরের সামনে শুকনো জবা বা লেবু যখন থেকে পড়ে থাকতে শুরু করল, আমায় আর মা ওদের বাড়ি পাঠাতো না। সেই হিসাবে, অন্ধ বিশ্বাসের বলি হয়ে আমার প্রথম জন্মানো নির্ভেজাল বিশ্বাস এবং বন্ধুত্ব ভেঙে যাওয়ার গল্পও নিজের বুকে জমিয়ে রেখেছে কেবলমাত্র আমার এই অবলা শহর।

বিশ্বাসের কথাই যখন এলো, তখন আরও একটু বলি তাহলে কেমন? কুসংস্কারে ভর না দিয়েও শুধু ভালোবাসার জোরেই এক নতুন বিশ্বাসকে নিজের মতো করে কিন্তু খুঁজেও পেলাম এরপর। কলকাতার প্রাণ জুড়ে যেই মহাকালীর প্রভাব বিস্তার, অদ্ভুতভাবে এবার তাঁর সাথে আলাপ হল আমার। বাড়িতেই মায়ের মন্দিরঘরে কালীঠাকুরের ছবি ছিল। অনেকদিন অবধি তাঁর অনাবৃত শরীর আমায় কিভাবে যেন বুঝিয়েছিল, উনি পুরুষ। তার একটা কারণও ছিল অবশ্য। আমাদের বাড়িতে গোপালঠাকুরের মূর্তিও ছিল একখানা। তা সেই ছোট্ট গোপালের জামা পরানোর সময় নজরে এসেছিল, ওনার কাঁচের শরীরের সবটুকুই আসলে এক্কেবারে খোলা। অতএব, ছেলেরাই জামাপত্র পরে না মানে ওই আর কি, দুয়ে দুয়ে চার!

তা সে যাই হোক, বন্ধু বিচ্ছেদের এই কঠিন সময়ে মা আমায় একদিন লেক কালীবাড়ি নিয়ে গেলেন। ওখানকার শাড়ি পরা ছোট্ট কালো কোষ্ঠীপাথরের ঠাকুরখানা দেখে কিভাবে কে জানে মন ভরে গেল। মা আমায় হাত জড়ো করা শিখিয়ে দিতে দিতে আনমনেই হঠাৎ বলে উঠেছিল, "ওনার উপর সবসময় বিশ্বাস রাখিস। ওনার চেয়ে বড় বন্ধু আর কেউ হয়না।"

কল্লোলিনীর বুকে সন্ধ্যা নেমে এসেছিল হঠাৎ। তার কালচে বর্ণে স্পষ্ট দেখেছিলাম, ঢল নেমেছে শ্যামাঙ্গিনীর উপাসনার।

এই শহর আমায় প্রথম সদ্যোজাত শিশুর ভেজা ভেজা মুখের অপরূপ সৌন্দর্য দেখিয়েছে। আমার তখন পাঁচ বছর বয়স। আগের বা পরের কোনো ঘটনা আর মনে না থাকলেও স্পষ্ট মনে আছে হাসপাতালের এক আধো অন্ধকার ঘরের মধ্যে ছোট্ট সাদা কটে শুয়ে থাকা আমার এক 'তুতো' ভাইকে; পরবর্তীকালে যে হয়ে উঠেছে এখন আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, এতটুকু একটা পুতুলের মাপের মানুষ কেমন নিশ্চিন্তে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার হাত পা মুখ তখনও সামান্য ফোলা, তার নাফোটা চোখে জমা একরাশ দুষ্টুমি, ছুঁয়ে দেখা হয়নি ঠিকই তবে স্থির বিশ্বাস – ওকে ছুঁলেই এক অন্যরকম নরমগরম গন্ধ মেখে যেত আমার গায়েও। এর চেয়ে আশ্চর্য আর কিসেই যে বা হওয়া যায়,

জানি না। প্রতিদিন হাজার হাজার এমনই সব জন্মের খতিয়ান লেখে কলকাতা – তার খেরোর খাতা আরও ভারী হয়ে জমতে থাকে প্রসূতির উদ্ধত পেটে – তবু এই সন্তানসমদের মুখের দিকে চেয়েই বোধহয় তিলোত্তমার এই ভরা প্লাবণেও কিছুতেই শ্রাবণ জোড়া আঁধার নামে না!

এই কলকাতার বুকেই আমার প্রথম বিয়ে দেখা। 'দেখা'ই বলব, কারণ উপহার পাওয়া আর সাজগোজ করা ছাড়া এই উৎসবের আর যে কি তাৎপর্য, তা তখনও বোঝার বয়স ছিল না। সানাই, ঝলমলে আলো, হইচই আর লুকোচুরি খেলা – এসবের ফাঁকফোকর গলেই চলতে থাকত আইবুড়োভাত, দধিমঙ্গল, গায়ে হলুদ, 'শ্রী' গড়া। সকাল থেকে যে বাড়িতে এত তোড়জোড়, উত্তেজনা – রাত পেরোলেই সেখানেই কনে বিদায়ের চিরন্তন ব্যথা, কান্না, যাতনা।

আর তারপরেই কিভাবে যেন নবসূচনার দাবী মেনে ভোরের আলো গায়ে মেখে হুশ করে বয়ে যেত এক যোজন সময়।

আমি বরাবরই দক্ষিণের আবহাওয়ায় মানুষ হলেও আমার বাবার অফিস ছিল শ্যামবাজার, ডালহাউসি চৌরঙ্গীর পুরোনো নোনাধরা সব চত্বরে। বাবার হাত ধরেই তাই আমার প্রথম আলাপ এই ব্রিটিশ আমলের ঐতিহ্যবাহী পুরোনো অফিসপাড়ার সঙ্গে। এইসব অঞ্চলের এক অদ্ভুত গন্ধ আছে – থমকে থাকার। যেন আশপাশের সব অগ্রগতির জটিলতাকে উপেক্ষা করাই তাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা। বড় হয়ে নিজে যখন চাঁদনী চকে চাকরি করেছি একবছর মতো, তখনও সেই পিছিয়ে পড়া অপরিবর্তিত গন্ধের হাত থেকে নিস্তার মেলেনি কিছুতেই। সেক্টর ফাইভও যেতে হবে না, একটু এগোলেই পার্ক স্ট্রিট বা ক্যামাক স্ট্রিট অঞ্চলেই কিন্তু দিব্যি মিলে যাবে নতুনত্বের আমেজ, ছিমছাম শৌখিনতা।

ছুটির দিনে মনে আছে, আমরা বাড়িতে বড় একটা থাকতাম না। কখনও কখনও বাবার কেনা সে সময়ের বহুল প্রচলিত ফিয়েট গাড়িতে চেপে ঘুরে আসতাম গঙ্গার ধার, দক্ষিণেশ্বর, বা বালী হাওড়ায় থাকা আমাদের কোনো আত্মীয়ের বাড়ি।

আবার কখনও কখনও কালীঘাট থেকে মেট্রোয় চেপে সোজা নামতাম শেষ স্টেশন এস্প্ল্যানেডে। তারপর সেখানকার কাছাকাছি হলে যা সিনেমা চলত তাই দেখে ধর্মতলার রিজেন্টে বা পার্ক স্ট্রিটের কোয়ালিটি বা পিটার ক্যাটে খাওয়াদাওয়া সেরে আবার পাড়ি দিতাম বাড়ির উদ্দেশ্যে।

খুব ছোটবেলায় ডবল ডেকার বাসের দোতলায় ওঠার শখেও যখন তখন চলে যেতাম আমরা তার শেষ অদেখা ঠিকানায় – হুজুগের হাওয়া গায়ে মেখে অচেনা সেই জায়গাকেই নিজের গন্তব্য করে নিতেও সেই পথেই শিখিয়েছিল কলকাতা।

আমার যখন আট বছর বয়স, বাবা তখন হঠাৎ নিজের একটুকরো আশ্রয় কেনার জন্য উঠেপড়ে লাগল। প্রতি শনি রবি তাই নতুন কোনো দালালের পাল্লায় পড়ে আমরা নানানদিকে ফ্ল্যাটের খোঁজ করা শুরু করে দিলাম। মায়ের ছিল একটাই চাহিদা – আস্তানা হতে হবে একদম নতুন – তা সে যতই ছোট হোক। অনেক এলাকাই সেই কদিনে প্রথম চেনা আমার। বিজয়গড়, সুলেখার মোড়, গড়িয়া, কিছুই বাদ দিচ্ছে না বাবা তখন – তবে কোথাওই মনের মতো কিছু জুটছে না। নিজের একটুকরো বাসস্থান জোটানো এই শহরে সত্যিই চারটি কথা নয়। সাধ আর সাধ্যের ব্যবধান সেখানে পরে রিয়াল এস্টেটেই কর্মসূত্রেও দেখেছি, কিভাবে যেন মিশেও মিশতে চায় না।

তখনও হাউজিং কম্প্লেক্স বা সোসাইটির ধারণা খুব একটা স্পষ্ট নয় কলকাতার কাছে। একদম শহরের বুকে ও জিনিস তৈরি করার মতো জায়গারও বড় অভাব। ঘিঞ্জি শহরকে দম নিতে দেওয়ার তাগিদেই তাই প্রশাসনের তরফ থেকে ততদিনে শুরু হয়েছে বৃহত্তর কলকাতা খুঁজে বার করার হালহদিশ এর খবরাখবর। বাবার এক চেনাশোনার মাধ্যমে এমনই এক নির্মীয়মান সোসাইটির কথা জানতে পেরে তাই হঠাৎই এক দুপুরে পৌঁছে গেলাম সোনারপুর।

গোলপার্ক গড়িয়াহাটের সদাব্যস্ত শহুরে জীবনযাপন থেকে বেরিয়ে সামান্য গেলেই যে এমন নিরিবিলি গাছগাছালি পুকুরে ঘেরা জায়গা সম্ভব, তা আগে জানা ছিল না। ভরদুপুরবেলা একমাথা বৃষ্টি সঙ্গে করে যখন নামলাম সোনারপুরে, প্রথম দেখাতেই হঠাৎ বড্ড ভালো লেগে গেল। তখনও অনেক চাষাবাদের জমি ছিল এই অঞ্চলে। অমন সবুজ নিভৃতে আমারও থাকবে একখানা নিজের মনের মতো ঘর – এও তো শুধু কলকাতার পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। যেহেতু রিটায়ার্মেন্ট পরবর্তী পরিকল্পনা হিসাবেই বাড়ি কেনা, তাই অফিস স্কুলের দূরত্ব নিয়ে আমরা আর কেউই তেমন মাথা ঘামালাম না। হালে কয়েকবছর আগে যখন অবশেষে বাসাবদল হল, ততদিনে স্টেশন রোড এলাকাটি অবশ্য বাইপাস রাজারহাটের পাশেপাশেই হয়ে উঠেছে রিয়্যাল এস্টেটের ব্যবসাপাতির প্রধান আর এক প্রাণকেন্দ্র। কিভাবে এই কয়েকবছরে ফুলেফেঁপে উঠল আমার কলকাতা, এ দুটি চোখ আজও তার একান্ত নিবিষ্ট সাক্ষী।

আমার বেড়ে ওঠার সমস্ত মুহূর্ত জমাট বেঁধে আছে এই শহরের আনাচেকানাচে। কোথাও বাইরে কয়েকদিনের জন্য গেলেও মনে হতো কবে গিয়ে আবার ভেড়াবো তরী আমার প্রাণপ্রবাহে। হাওড়া বা শিয়ালদাহ স্টেশনই হোক কি দমদমের এয়ারপোর্ট, শহরে প্রথম ঢোকার সময়ের হঠাৎ করে ফুটে ওঠা রঙ বর্ণ ধ্বনি আর ঘামের গন্ধের কোলাজই এই শহরের নিজস্ব বৈচিত্র্য। এখানকার প্রতিটি মরসুম একে অপরের থেকে আলাদা – তবু কোথায় গিয়ে যেন তারাই আবার একসুরে নিবিড়ভাবে বাঁধাও। কত রাজনৈতিক উত্তেজনা আর পরিবর্তন ভরিয়ে তুলেছে এর রাজপথ, ব্রিগেড, তবু কখনই এক মুহূর্তের জন্যও থমকে যায়নি কল্লোলিনী।

'এই শহর জানে আমার প্রথম সবকিছু' – সবাইকে লুকোনো গেলেও এই অন্তরমহলকে যে আসলে উপেক্ষা করা যায়না কোনোমতেই। যেই শহরে গড়িয়াহাট থেকে গোলপার্ক আসতে পথ ভুল করেছি একসময়, এম বি এ করেও রিসেশনের ফাঁদে পড়া প্রথম সেলসের চাকরির সুত্রে সেই শহরই আবার হাতে ধরে চিনিয়েছে তার কত না দেখা অজানা সম্পদ। কলেজের কত আড্ডা, তর্ক, কান্না, বিচ্ছেদের গল্প শুনেছি আজও রাতে বিড়বিড় করে জপতে থাকে এই শহর। হাতে টানা রিক্সা থেকে বি এম ডব্লিউ – সবই আজও একই ভাবে তার পাঁজর কেটে কেটেই এসিটা বাড়িয়ে ঘামে ভেজা শরীর লুকিয়ে চলে যায় নিরন্তর। নিজের চোখেই তো সমস্তটা দেখা। প্রথম প্রেমের নৌকো ভাসিয়েছি একদিন যেই গাঙ বরাবর, তারই পাশাপাশি সেখানে ভেসে যেতে দেখেছি মাটির কলস ভর্তি অস্থি আর নাভি, শ্মশানের নির্লিপ্ত বুকে নিজের মা'কে দাহ করে আসার পর।

কলকাতা আমার সব কেড়ে নিয়েছে। রাতের পর রাত অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে তাই উপেক্ষা করেছি কত তাকে। তার থেকে পালানোর চেষ্টায় হাতড়ে বেড়িয়েছি পথ – অথচ আজ একবছর যাবত এতদূরে সিডনি শহরে ঘর করেও টের পাচ্ছি, আমি শহর ছেড়ে চলে এলেও সে আমায় কখনোই ছেড়ে যায়নি। যাবার কথাও তো লেখাপড়া বা সইসাবুদ করে নিইনি কখনও, তাই না ?

আজও তাই যখন সোশ্যাল মিডিয়ার কারচুপিতে একের পর এক ভেসে ওঠে ভিক্টোরিয়া, রবীন্দ্রনাথ, দুর্গাপুজো, বইমেলা আমার মুঠোফোনের জ্বলজ্বলে স্ক্রিনে – গুনগুন করে মননের গহিনে বেজে ওঠে লোকগীতের বোল –

"তোরে হৃদমাঝারে রাখিব, ছেড়ে দিব না।"

---

**পারিজাত ব্যানার্জী** – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

সুজয় দত্ত

# বিশ্বপরিক্রমা

প্রায় দেড়শো বছর আগে লেখা 'অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ্' তো আজ ইতিহাস । জাম্বো জেটে চড়ে বিষুবরেখা-বরাবর নিরবচ্ছিন্ন উড়ানে এখন পৃথিবী পরিক্রমা করতে লাগবে বড়জোর দিন দুয়েক । শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমানে চাপলে তো আরোই কম । অবশ্য জুল ভের্নের উপন্যাসের সেই ফিলিয়াস ফগ আর জঁ পাস্পার্তুর মতো বিভিন্ন মহাদেশের নানান শহরে থেমে থেমে বিশ্বপরিক্রমা করতে চাইলে সেটা আরো একটু সময়সাপেক্ষ । কিন্তু আশি দিন কিছুতেই নয় ।

আমার যেমন লাগল পাঁচ দিন । আমি কিন্তু প্লেনে চড়িনি । বুলেট ট্রেন, ম্যাগ্-লেভ, বেলুন বা গ্লাইডার — কোনোটাতেই না । আমি ঘুরলাম ট্যাক্সিতে । হ্যাঁ, ট্যাক্সিতে । বিশ্বাস হচ্ছে না ? কেন, সেই পৌরাণিক গল্পটা মনে নেই, যেখানে হরপার্বতী তাঁদের দুই ছেলেকে বললেন 'দেখি তোমাদের মধ্যে কে আগে ব্রহ্মান্ড পরিক্রমা করে আসতে পারো'? শুনে কার্তিক বেরিয়ে পড়লেন তাঁর ময়ূরে চড়ে, কিন্তু গণেশের ভরসা তো ইঁদুর! তবুও শেষ অবধি জিতলেন গণেশই, কারণ তিনি চট করে নিজের মা-বাবাকে এক পাক মেরে বললেন 'তোমরাই তো ব্রহ্মান্ড, তোমাদের পরিক্রমা মানেই তো ব্রহ্মান্ড পরিক্রমা'। আমার ক্ষেত্রেও কতকটা সেরকমই — পৃথিবীর সব মহাদেশের মানুষের সঙ্গে মোলাকাত হলেই তো এক অর্থে বিশ্বভ্রমণ হয়ে গেল ।

আসলে কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম কলোরাডোর ডেন্ভারে । পাঁচ দিনের জন্য । কারণটা পেশাগত — একটা বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নেওয়া । রকি মাউন্টেনের কোলে ছবির মতো শহর ডেন্ভার । যে হোটেলে ছিলাম সেটা সম্মেলনস্থল থেকে খানিকটা দূরে হওয়ায় সকাল-বিকেল মিনিট পনেরো-কুড়ি ট্যাক্সিতে চাপতে হত । আর তাতেই 'বসুধৈব কুটুম্বকম' । প্রথম দিনেই দুটো মজার জিনিস আবিষ্কার করলাম । এক, পর্যটকদের সুবিধার জন্য এ-শহরের ট্যাক্সি কোম্পানীগুলোর ফোন নম্বরে একই সংখ্যার পুনরাবৃত্তি (যেমন ৩৩৩-৩৩৩৩, ৪৪৪-৪৪৪৪ বা ৯২২-২২২২) আর দুই, এখানকার ট্যাক্সিচালকদের অবিশ্বাস্যরকম আন্তর্জাতিকতা । বেশীরভাগই তৃতীয় বিশ্বের নানা দেশের । ইউরোপীয়ান অভিবাসীও যে নেই তা নয় । তুলনায় স্থানীয় সাদাচামড়া বিরল । এর আগে এদেশের ছোট-বড় নানা শহরে ট্যাক্সি চড়েছি, এটা জানা আছে যে চালকেরা মোটামুটি তিন ধরণের হয় । এক, যারা যাত্রার শুরুতে একটা দায়সারা সম্ভাষণ আর শেষে ভাড়াটা কিসে দেব — ক্যাশে না ক্রেডিটকার্ডে — জানতে চাওয়া ছাড়া সারা রাস্তা স্পীক্টি নট । দুই, যারা আমার সঙ্গে শুরুর সম্ভাষণ আর শেষের আর্থিক লেনদেনের সময় ছাড়া কথা না বললেও ক্রমাগত নিজের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ফোনে বাক্যালাপ চালিয়ে যাবে (অধিকাংশক্ষেত্রেই নিজের মাতৃভাষায়) । আর তিন, যারা আমি নীরব থাকতে চাইলেও গায়ে পড়ে গল্প করবে, পেটের কথা টেনে বার করার চেষ্টা করবে । তা, এই পাঁচদিন আমার ভাগ্যে দশবারের মধ্যে ছবারই জুটেছিল গল্পবাজ ।

প্রথমদিন এয়ারপোর্ট থেকে ট্রেন নিয়ে শহরকেন্দ্রের স্টেশনে নেমে সেখান থেকে ট্যাক্সি ধরার জন্য চওড়া ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছি । তখনও কোনো ট্যাক্সি কোম্পানীর ফোননম্বর জানা নেই । বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর দেখলাম রাস্তার উল্টোদিকের ফুটপাথে ঘ্যাঁচ করে একটা কালো রঙের মিনিভ্যান এসে দাঁড়াল, গায়ে লেখা 'ইয়েলো ক্যাব, ৩৩৩-৩৩৩৩'। বাঃ, বেশ মজার ব্যাপার তো — কালোরঙের হলুদ ট্যাক্সি ! আমি সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারকে হাত দেখিয়ে অপেক্ষা করতে বলে রাস্তা পার হতে গেলাম । ব্যস্ত রাস্তা, রবিবারের সকালেও প্রচুর গাড়ীঘোড়া, পার হওয়া মুশকিল । আমি উল্টোদিকে পৌঁছনোর আগেই দেখি দুজন পুরুষ ও মহিলা একগাদা মালপত্র নিয়ে মিনিভ্যানটার পাশে এসে দাঁড়ালেন আর ড্রাইভারকে বললেন গাড়ীর পিছনটা খুলে দিতে । আমি হতাশ — যাঃ, তীরে এসে তরী ডুবল ! এখন আবার কতক্ষণের অপেক্ষা

কে জানে ? কিন্তু ড্রাইভার তার সীট ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে সেই ইনরোপীয় চেহারার শ্বেতকায় দম্পতিকে হাত-পা নেড়ে কীসব বলল, দেখলাম আমি যেতেই তাঁরা অপরিচিত অ্যাক্সেন্টে ''সরি জেন্টল্‌ম্যান, ইউ গো ফার্স্ট '' বলে সরে দাঁড়ালেন । আর লম্বাচওড়া চেহারার সেই কৃষ্ণকায় ড্রাইভার আমার হাতের স্যুটকেস একপ্রকার ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে গাড়ীতে উঠতে বলে লাফ দিয়ে চালকাসনে গিয়ে বসল । গাড়ী চলতে শুরু করল ।

''হ্যালো স্যার, হোয়্যার আর উই গোয়িং টুডে ?'' আফ্রিকানদের ইংরেজী বলার এই ধরণ আমার খুব পরিচিত, কারণ আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়াই সেখানে ঐ মহাদেশ থেকে আসা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম নয় ।

উত্তরে আমি গন্তব্যের ঠিকানা বলে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাকে নিলে না কেন ? শেয়ারে যেতাম । এত বড় ট্যাক্সিতে আমি একা যাচ্ছি ।

''নো নো, দে হ্যাড টু মাচ লাগেজ। তোমার অসুবিধে হত । তাছাড়া —''

''তাছাড়া ?''

''আরও একটা কারণেও তোমাকে আগে নিলাম ।''

''কী কারণ শুনি ।'' আমি কৌতূহলী । সেই কোন ভোরে উঠে ক্লীভল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করেছি, কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি, কিছুটা ক্লান্ত-বিধ্বস্ত তো দেখাচ্ছেই আমাকে । সেটাই বলবে হয়তো ।

''বিকজ ইউ আর অ্যান ইন্ডিয়ান । ইউ আর ফ্রম ইন্ডিয়া — রাইট ?''

কীকরে বুঝলে আমি ইন্ডিয়ান — এই বোকাবোকা প্রশ্নটা আর করলাম না । মার্কিন মুলুকে যতবছর আছি, আমার চেহারা দেখে ভারতীয় বলে চিনে নিতে কখনও কারো অসুবিধে হয়েছে এমন মনে পড়েনা । একবার লন্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে এক রেলকর্মী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল ''আর ইউ এ পাকিস্তানী ?'' কিন্তু এদেশে কেউ কখনো আমাকে আমার প্রতিবেশী দেশের লোক বলেও ভুল করেনি । ড্রাইভারকে বললাম, ''হ্যাঁ, আমি ভারতীয় । তাতে কী ?''

''ভারতীয়দের আমি খুব পছন্দ করি । আমি যেখানে থাকতাম সেখানে প্রচুর আছে ।''

''কোথায় থাকতে তুমি ?'' আমিও এখন গল্প করার মুডে ।

''আফ্রিকা ।''

''সে তো বুঝতেই পারছি । আফ্রিকার কোথায় ?''

কিছুক্ষণ দ্বিধার পর ও বলেই ফেলল, ''কেনিয়া''। দ্বিধাটা স্বাভাবিক । এই মুহূর্তে এদেশে কোনো অভিবাসীই (আইনসম্মত বা বেআইনী) সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ে নেই । অচেনা লোকের কাছে উন্মুক্ত হবার আগে দুবার কেন, পাঁচবার ভাবতে হয় ।

''ও, কেনিয়া ? নাইরোবি তো ? ওখানে আমার চেনাশোনা কিছু লোক ছিল এককালে ।''

''নো স্যার, নট নাইরোবি । মোম্বাসা নামটা জানা আছে ?''

''অবশ্যই । ভারত মহাসাগরের তীরে কেনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আর বৃহত্তম বন্দর । বাণিজ্যিক আর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ।'' সত্যজিত রায়ের সোনার কেল্লার ভিলেন সেই মন্দার বোসের মতো ম্যাট্রিকে ছাপ্পান্ন না পেলেও ভূগোলে আমার জ্ঞানটা নেহাত কম নয় । ফলাবার সুযোগ পেলে কেউ ছাড়ে ?

''ইয়েস্, সেই মোম্বাসা। কত ভারতীয় থাকে কোনো আইডিয়া আছে?''

''না তবে লাখ পনেরো লোকের শহর যখন, সংখ্যাটা বেশীই হবে ধরে নিচ্ছি।''

''পনেরো? ফুঃ! গ্রেটার মেট্রোপোলিটান এরিয়া ধরলে তিরিশ লাখের কম নয়। আর সেখানে ভারতীয় কিলবিল করছে। নাইরোবিতে পাড়ায় পাড়ায় মন্দির, জানো? মোম্বাসায় অতটা নয়, কিন্তু আছে অনেক। ব্যবসাপাতি, দোকানপাট সব বেশীরভাগ ভারতীয়দের দখলে। ইউ পিপ্‌ল্ আর ইন্টেলিজেন্ট। ওসব ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে এঁটে ওঠে কার সাধ্যি? হ্যাঁ, চীনারা পারে। তবে তারা এখনো অতটা জেঁকে বসেনি কেনিয়ায়।''

''তাই নাকি? তাহলে ভারতীয় খাবারদাবার বেশ ভালই পাওয়া যায় বল? আর বলিউডের সিনেমা-টিনেমা — সেসবও খুব চলে নিশ্চয়ই?''

''সে তো চলে, কিন্তু তোমাদের জন্য এই আমরা মানে স্থানীয়রা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছি। গরীব করে রেখে দিয়েছ আমাদের। শুধু তাই নয়, ইন্ডিয়ানরা অনেকে চাকরবাকর ভাবে আমাদের, জানো? বলে ব্ল্যাক্‌স্। আচ্ছা, তোমরা কি হোয়াইট? ইডি আমিন যখন পাশের দেশ থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে খেদিয়েছিল, সেই ভারতীয়দের আশ্রয় দিয়েছিল কে? আমরা কেনিয়ানরাই তো? এখন তারাই আমাদের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে।''

ওকে বলতে যাচ্ছিলাম যে ভাই, সাদা-কালোটা আসলে মানুষের চামড়ায় নয়, মনে। কিন্তু ইডি আমিনের ঘাড়ধাক্কার প্রসঙ্গ শুনে বুঝলাম এখন ঐসব দার্শনিক কথাবার্তা বললে ওর সেন্টিমেন্টে আরো ইন্ধন জোগানো হবে। তাই কথা ঘোরাবার জন্য বললাম ''তবে যে বলছিলে তুমি ভারতীয়দের পছন্দ কর?''

''হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো আমার নিজের কথা। আমার মা একটা ভারতীয় পরিবারে ন্যানি ছিল, জান? সেই বাড়ীর বুড়িমা — আমি গ্র্যান্ডমা বলতাম — আমাদের খুব ভালবাসত। তোমাদের ফেস্টিভালের সময় — কী যেন বলে, ডুসেরা আর ডাওয়ালি — আমাদের কত খাওয়াত, গিফ্‌ট্ দিত। আমি নিজেও ইস্কুলে ইংরেজী শিখেছি একজন ভারতীয় মাস্টারমশাইয়ের কাছে।''

যাক, ও দশেরা-দিওয়ালীর কথা বলায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম, কথোপকথনটা তিক্ততার মধ্যে দিয়ে শেষ হল না তাহলে। ইতিমধ্যে হোটেল এসে গেছে আমার। গাড়ী থামতে ওর দিকে ক্রেডিটকার্ড এগিয়ে দিয়েছি, ও হঠাৎ বলল ''ডাউনটাউনে এত হোটেল থাকতে এত দূরে উঠেছ কেন? তোমাদের ভারতীয়দের এই এক দোষ, যতই টাকাপয়সা থাক প্রাণ খুলে জীবনটাকে ভোগ করতে পার না।''

এর উত্তরে আমি আর কী বলব! বার্ষিক সম্মেলনে আমি এবার অনেক দেরী করে রেজিস্টার করায় তাদের তালিকায় যে ভাল ভাল হোটেলগুলো ছিল তার একটাতেও কনফারেন্স-রেটে বুকিং পাইনি। তাই মোটামুটি একইরকম ভাল হোটেল পেতে একটু শহরতলির দিকে নজর দিয়েছি। এত লম্বা ব্যাখ্যা না দিয়ে শান্তভাবে বললাম, ''এই হোটেলটা দেখে কি তোমার সস্তা মনে হচ্ছে?''

''না না, তা নয়'' ও লজ্জা পেল একটু, ''কাল সকালে আবার ট্যাক্সি লাগলে এই নম্বরে ফোন কোরো। আর ইউ ইন্ডিয়ান্‌স্ আর অল্‌ওয়েজ ওয়েলকাম ইন মাই কান্ট্রি। ওকে স্যার? এখন চলি।''

ওকে আর বললাম না, তবে সাধারণ কেনিয়ানদের মনে যাই থাক, কেনিয়ায় বসবাসকারী এশীয় বংশোদ্ভূতরা যে তাদের দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক অবদানের জন্য অন্ততঃ সরকারীভাবে সেদেশে 'ওয়েলকাম' তার প্রমাণ সম্প্রতি মিলেছে রাষ্ট্রপতি উহুরু কেনিয়াটা-র এক ঘোষণায়। ওখানে যে সাংবিধানিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৪৩টি উপজাতির বাস, তাদের পরেই ৪৪তম উপজাতির মর্যাদা তিনি দিয়েছেন এশীয়দের। বছর তিনেক আগে।

পরদিন সকালে ট্যাক্সি ডাকতে গিয়ে ৩৩৩-৩৩৩৩ নম্বরটা যখন বারবার এনগেজ্‌ড্‌ পেলাম, হোটেলের রিসেপশনে ফোন করে ওদেরই ডেকে দিতে বললাম একটা। দেখা গেল এবার গাড়ীর গায়ে লেখা ফোননম্বর ৯২২-২২২২। আগের দিনের অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে ভাবতে গাড়ীতে উঠেই বুঝলাম নাঃ, এযাত্রা আর তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছেনা। মাঝারি ভল্যুমে রেডিও চালিয়ে চালকাসনে বসে আছে এক স্থানীয় শ্বেতকায়। এক দিক দিয়ে ভালই — বাড়ীতে থাকতে প্রতিদিন সকালে আমার ঘন্টাখানেক খবরটবর শোনার অভ্যেস রেডিওতে। অপ্রত্যাশিতভাবে জুটে গেল সেই সুযোগ।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা হোটেলে ফেরার সময় কী নাচছে ভাগ্যে ? স্পীক্‌টি নট, না অনর্গল ? আবার ৩৩৩-৩৩৩৩ এ ফোন করে একটা ট্যাক্সি পাঠাতে বলছি, হঠাৎ সেই কথোপকথনের মাঝপথে দেখি সম্মেলনকেন্দ্রের সামনে গাড়ী থামার জায়গাটায় একটা সবুজ মিনিভ্যান এসে যাত্রী নামাচ্ছে। মাথায় ট্যাক্সির চিহ্ন লাগানো। আমি তাড়াতাড়ি ফোনে গাড়ী পাঠাতে বারণ করে ওটাকেই ধরতে ছুটলাম। ভেতরে স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসে থাকা ছিপছিপে লম্বা কৃষ্ণকায় যুবককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল গাড়ীর মালিক অরেঞ্জ ক্যাব কোম্পানী, নম্বর ৪৪৪-৪৪৪৪। বাঃ, জবাব নেই ! কালো রঙের হলুদ ট্যাক্সির পর এবার সবুজ রঙের কমলা ট্যাক্সি ! ডেনভারের রেস্তোরাঁ বা বারগুলোয় কি তাহলে লালরঙের হোয়াইট ওয়াইন বা বেগুনীরঙের ব্লু চীজ পাওয়া যায় ? নাকি এটা সাম্প্রতিককালের জনপ্রিয় হলিউড মুভি 'অরেঞ্জ ইজ দ্য নিউ ব্ল্যাক'-এর মতো ব্যাপার ? যাইহোক, এই ছেলেটি প্রথমে ফোনে তার দেশোয়ালি কারো সঙ্গেই কথা চালাল খানিকক্ষণ। ইংরেজীতে নয়, তাই আমার বোঝার প্রশ্ন নেই। কিন্তু কয়েকটা শব্দ চেনা — যেমন 'ইন্‌জেরা' আর 'সাম্বুসা'। কোথায় যেন শুনেছি ? তাছাড়া এই চেহারা আর বাচনভঙ্গীও এত চেনা লাগছে কেন ? সহসা বিদ্যুৎচমকের মতো খেলে গেল মাথায় — আরেঃ, এ তো চলনে-বলনে অনেকটা আমার ইউনিভার্সিটির এক প্রাক্তন সহকর্মীর মতো যিনি আমাদের বিভাগে একসময় সহকারী অধ্যাপক ছিলেন কিন্তু এখন ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর দেশ যেন কোথায় ছিল ? মনে পড়েছে ! ইথিওপিয়া ! আর তাঁরই পরামর্শে একদিন ক্লীভল্যান্ডের একমাত্র ইথিওপিয়ান রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে প্রথম শুনি ঐ 'ইন্‌জেরা' আর 'সাম্বুসা' শব্দদুটো। ইন্‌জেরা আর কিছুই না, আমাদের চিরপরিচিত গোলারুটি, শুধু ডাল বেটে ফেটানোর সময় কিছু একটা মেশায় যাতে একটু টক-টক হয় স্বাদটা। আর সাম্বুসা কথাটা শুনে কী মনে হচ্ছে ? সামোসা বা সিঙাড়ার মতো কিছু ? মূলতঃ তাই-ই ওটা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইথিওপিয়ানরা এগুলো বহু প্রজন্ম আগে পেয়েছিল পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয় আভিবাসীদের থেকেই। ছেলেটার ফোনালাপ থামতেই তাই আত্মবিশ্বাসী গলায় প্রশ্ন করলাম, ''তুমি ইথিওপিয়ান তো ?''

''কী দেখে মনে হল আমি ইথিওপিয়ান, স্যার ?''

''না, মানে, তোমাকে আমার পরিচিত একজনের মতো দেখতে যাঁর বাড়ী আদ্দিস-আবাবায়। তাছাড়া একটু আগেই ইন্‌জেরা ব্রেড আর সাম্বুসা ফ্রাইয়ের কথা বলছিলে। তাই —''

''আই সী। নাঃ, আমি আসলে এরিট্রিয়ার লোক। ইথিওপিয়ার ঠিক পাশেই। আমাদের খাওয়াদাওয়া, পোশাক-আশাক, কালচারের সঙ্গে ওদের অবশ্য মিল আছে।''

''আর ভাষা ?''

''আমাদের দেশে তো দশরকম ভাষা। তার কোনোটা কোনোটা ওখানেও চলে। যেমন আমি যেটায় কথা বলছিলাম একটু আগে। তবে ওদের অফিসিয়াল ভাষা 'আমহারিক' আমরা বলিনা।''

''তুমি কিসে কথা বলছিলে ?''

''তিগ্রিনিয়া, স্যার। এরিট্রিয়ায় আমরাই মেজরিটি। বছর কুড়ি আগে কোনো এরিট্রিয়ানকে ইথিওপিয়ান বললে কিন্তু মুশকিলে পড়ে যেতেন স্যার।''

''বছর কুড়ি আগে ? মানে তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল যখন ?'' উত্তরপূর্ব আফ্রিকার এই দুই প্রতিবেশী দেশের সংঘাতের কথা আমার অজানা নয়। সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত খবর হত এককালে।

''রাইট । যুদ্ধে-যুদ্ধে ছারখার হয়ে গেল আমার দেশটা । তিরিশ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধ, তারপর স্বাধীনতার সাত বছর যেতে না যেতেই আবার যুদ্ধ । ১৯৯৮ সালে ।''

''সে-যুদ্ধ তো বেশীদিন চলেনি । বছর দুয়েক, তাই না ?''

''কে বলল দুবছর ? কুড়ি বছর — কুড়ি বছর ধরে যুদ্ধপরিস্থিতি ছিল দুদেশের মধ্যে । সীমান্ত-বরাবর ছোটবড় ঝামেলা লেগেই থাকত । ২০০০ সালে গোলাগুলি বোমা-মিসাইল বন্ধ হলেও কোনো শান্তিচুক্তি হয়নি যে ।''

''ও । তা সে-যুদ্ধে তোমার পরিবারের বা আত্মীয়স্বজনের কেউ —''

''ওসব কথা উঠলে রক্ত গরম হয়ে যায় স্যার । জিজ্ঞেস করছেন তাই বলছি । কেউ তো জানতে চায়না । আমার ঊনত্রিশ বছর বয়স । জন্মেছি মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে । বাবা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী । তারপর সবে যখন ইস্কুলে ভর্তি হয়েছি, আবার শুরু হল যুদ্ধ । বাবা অক্ষম হয়ে পড়েছেন, দাদা তখন সতেরো, সংসারের ভার ওর কাঁধে । একদিন ইয়ং ব্রিগেডের হয়ে যুদ্ধে চলে গেল । কাউকে না জানিয়ে । মা কত কাঁদল । আর ঘরে ফেরেনি ও — আর ফেরেনি । শুনেছিলাম ইথিওপিয়ায় যুদ্ধবন্দী হয়ে ওদের জেলে —'' বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে আসে ওর ।

''ঠিক আছে, ঠিক আছে । ওসব কথা থাক । তুমি এরিট্রিয়ায় থাকতে কী করতে, তাই বল । হঠাৎ চলে এলে যে এদেশে ?''

''আমি আসমারায় একটা কলেজে পড়তাম ইতিহাস নিয়ে । পড়া শেষ করে বেকার হয়ে বসেছিলাম । ওখানে আমাদের বয়সী ছেলেদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই । নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনে আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় রয়েছে বেশ কয়েকবছর । যুদ্ধ চলাকালীন সে আমেরিকায় শরণার্থী ভিসায় আসে । তার সঙ্গে যোগাযোগ করে একদিন —''

''আমার হোটেল কিন্তু এসে গেছে ।''

''ও হ্যাঁ । সরি । অনেক কথা বলে ফেললাম । ইউ নো হোয়াট, স্যার, জাস্ট বেসিক ফেয়ারটাই দিন, সারচার্জ আর ট্যাক্স লাগবে না ।''

''আচ্ছা, যা বলবে । আর নাও, এটা রাখ ।''

''থ্যাংক ইউ, স্যার । টিপ্‌স্ দেওয়ার দরকার ছিলনা । আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লেগেছে ।''

''টিপ্‌স্ নয়, ওটা উপহার । আর তো দেখা হবেনা তোমার সঙ্গে — যদিনা আগামী কদিনে আবার আমায় রাইড দিতে আস ।''

''হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই । আমার সেলফোনের নম্বরটাই দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে । আর আপনাকে কী দিই বলুন তো — হ্যাঁ, এই আদা-লজেন্সটা নিন । এরিট্রিয়ার জিনিস, ভাল খেতে । পারলে বেড়িয়ে আসবেন আমার দেশে — রেড সী-র দারুণ দারুণ বীচ আছে, আসমারায় সুন্দর সুন্দর ইতালিয়ান চার্চ আর প্রাসাদ আছে ।''

ওর গাড়ীর মিলিয়ে যাওয়া লাল আলো দেখতে দেখতে কোথায় যেন ওর গল্পের সঙ্গে আমার জন্মেরও আগে হওয়া প্রতিবেশী দেশের মুক্তিযুদ্ধের টুকরো টুকরো শোনাগল্পের মিল খুঁজে পেলাম । তখন কি আর জানতাম ইথিওপিয়া-এরিট্রিয়ার মধ্যে স্থায়ী শান্তিস্থাপনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য দুমাস বাদেই নোবেল শান্তি পুরস্কার পাবেন ইথিওপিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবিই আহ্‌মেদ ?

এর পরের ছত্রিশ ঘন্টা আর বলার মতো কিছু ঘটেনি । পরদিন সকালে ট্যাক্সি লাগল না কারণ আমার হোটেলেরই একজন সহৃদয় ব্যক্তির কাছে লিফ্‌ট্ পেলাম । ডাউনটাউনের দিকেই যাচ্ছিলেন তিনি । সেদিন বিকেলে ইয়েলো ট্যাক্সিতে

স্থানীয় একজনকে পেলাম যে বেজায় গল্পবাজ । কিন্তু তার গল্পের বিষয়বস্তু মূলতঃ খেলা — বেসবল, বাস্কেটবল, আমেরিকান ফুটবল, সকার । সারা দেশের সব স্পোর্টস্ টীমের হাল-হকিকৎ তার নখদর্পণে । আমি আবার নখ কেন, কোনো দর্পণেই ওসব খেলার খবর তেমন রাখিনা (এক সকার ছাড়া) । তাই মূলতঃ শ্রোতা হয়েই রইলাম । লাভের মধ্যে এটুকুই যে হোটেলে ফেরার পথে ডেনভারের দর্শনীয় যা যা পড়ল (মায় ফুটবল আর বেসবল স্টেডিয়াম অবধি), অভিজ্ঞ গাইডের মতো আমাকে সেসব চেনাতে চেনাতে গাড়ী চালাল ও । আর ক্ষতির মধ্যে অফিসটাইমের জ্যামে আটকে পাক্কা আধঘন্টা বেশী লাগল হোটেলে পৌঁছতে, যার ফলে ভাড়াও দিতে হল অনেকটা বেশী । এর পরের দিন একটু বেশী আগে যাওয়ার ছিল কনফারেন্স সেন্টারে, তাই ভোরভোর ৯২২-২২২২ ডেকে বেরিয়ে পড়লাম । ড্রাইভার গোমড়ামুখো রাশভারী । সারাটা রাস্তা নৈঃশব্দ্য — না কথা, না রেডিও । নামার ঠিক আগে শুধু ভদ্রলোক মনে করিয়ে দিলেন যে এ-শহরের রাস্তায় অনেক বিদেশী ট্যাক্সিড্রাইভার আছে এবং আমি যেন তাদের সম্বন্ধে একটু সাবধান থাকি কারণ তারা বাইরে থেকে আসা ট্যুরিস্ট দেখলে অনেকসময় ইচ্ছে করে ঘুরপথে গিয়ে বেশী ভাড়া নেয় । আমি আর কী বলব, নীরবে হাসলাম ।

সেদিন সন্ধ্যায় আবার ৪৪৪-৪৪৪৪, কারণ অন্য নম্বরগুলো এন্‌গেজ্‌ড্ । ফোনে গাড়ী পাঠাতে বলে কন্‌ফারেন্স সেন্টারের সামনের ফুটপাথে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি । অনেকক্ষণ হয়ে গেল, ট্যাক্সির 'ট'ও চোখে পড়ছে না । হঠাৎ একটা ভারী গলা কানে এল —

''হে মান । ডিডিউ কল্ ফর আ টাক্সি মান ?''

আমি মাথা নেড়ে বিনাবাক্যব্যয়ে উঠে পড়লাম পিছনের সীটে । সামনে চালকাসনে একটা বড়সড় চেহারা, মাথায় উল্টো করে পরা বেসবল ক্যাপের তলা থেকে বেরিয়ে আছে কিংবদন্তী রেগে-শিল্পী বব মার্লির মতো 'রাস্ তাফারি' স্টাইলের জটা আর বিনুনি । আর কথায় কথায় ''মান'' কারা বলে, সেটাও আমার অজানা নয় । ছোটবেলা থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটারদের সাক্ষাৎকার আর সেখানে টেস্ট সিরিজ চলাকালীন সেখানকার ধারাভাষ্যকারদের ভাষ্য শুনেছি অনেক । সুতরাং এ যে ক্যারিবিয়ান বংশোদ্ভূত তাতে কোনো সন্দেহ নেই । এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঠিক কোন দ্বীপের বাসিন্দা এ বা এর পূর্বপুরুষ ? কৌতূহলটা মনেই চেপে রাখলাম, কারণ হঠাৎ করে কাউকে তো ওরকম জেরা করা যায়না । তবে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলনা, মিনিটকয়েক বাদে ও নিজেই মুখ খুলল — ''আচ্ছা, এই কন্‌ফারেন্সটা কি ইন্ডিয়ানদের ?''

''না তো । কেন ?''

''আজ সারাদিনে তুমি হলে চার নম্বর ভারতীয় যাকে আমি এই কন্‌ভেন্‌শন সেন্টারে নাবিয়েছি বা এখান থেকে তুলেছি ।''

''ও । আসলে কন্‌ফারেন্সটা স্ট্যাটিস্টিকাল সায়েন্সের । যেহেতু বহু ভারতীয় এই পেশায় আছে, তাই —''

''আই সী । দেখে আমার ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্ট ইন্ডিজের কথা মনে পড়ছিল । সেখানেও কত ভারতীয় ।''

''ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ? কোথায় ? জামাইকার কিংস্টনে ?''

''না না, ত্রিনিদাদের পোর্ট অফ স্পেনে । আমি ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবেগোয় বড় হয়েছি । তারপর এদেশে এসেছি ।''

''আচ্ছা । তুমি পড়তে নাকি ওখানে ?''

''নাঃ, আমার বোন পড়েছে । আমার আর পড়াশোনা-টোনা তেমন হয়নি । আই অ্যাম মোর ইনটু মিউজিক ।''

''তাই নাকি ? কীরকম মিউজিক ? গান ?''

''ইয়েস মান । রেগে । রেগে ইজ মাই হার্ট অ্যান্ড সোল । অবশ্য আমি স্টীল ড্রাম্‌ও বাজাই ।''

''বাঃ। তোমাদের বব্ মার্লের গান আমি ভারতে থাকতেই শুনেছি। আর স্টীল ড্রাম্ও আমার দারুণ লাগে।''

''তোমাদের ভারতীয় মিউজিকও কিন্তু আমরা রাতদিন শুনি। খুব মশলাদার। খুব রিদ্মিক।''

''কী ? বলিউড ?''

''না না, আমি 'চাটনি সোকার' কথা বলছি। ক্যারিবিয়ান ক্যালিপ্সো আর বলিউডের মিক্সচার।''

''ও, হ্যাঁ, ওটা আমারও মন্দ লাগেনা। প্রথম যখন শুনেছিলাম পোর্ট অফ স্পেনের একটা ক্যাসেট-সিডির দোকানে, কিনে এনেছিলাম কয়েকটা।''

''তুমি ত্রিনিদাদে গেছ ? সত্যি ?''

''হ্যাঁ। অনেক বছর আগে। টোবেগোতেও গেছিলাম। বড় সুন্দর দেশ তোমাদের। এখনো ছবির মতো মনে আছে সবকিছু।''

''কী কী দেখেছ শুনি ?''

''কুইন্স পার্ক সাভানায় লালে লাল কৃষ্ণচূড়ার ক্যানোপি, তোমাদের পার্লামেন্ট হাউস, লা ব্রী-তে পিচ আর অ্যাস্ফল্টের খনি, কারানি সোয়াম্পে লাল টুকটুকে ফ্লেমিংগো আর স্কারলেট আইবিসের ভীড়, এসা রাইট অভয়ারণ্যে গাছপালা-জীবজন্তু — এইসব।''

''গুড। আচ্ছা, তুমি ভারতীয় যখন, ক্রিকেটপাগল নিশ্চয়ই।''

''পাগল না হলেও ভালবাসি খেলাটা। কেন, তোমাদের গুরুদেবের বাড়ী দেখেছি কিনা জিজ্ঞেস করবে ? দূর থেকে দেখেছি। ব্রায়ান লারা প্রোমেনাডে একটা টিলার ওপর লারার প্রাসাদ। আর কুইন্স পার্ক ওভাল ক্রিকেট মাঠটা বাইরে থেকে দেখেছি শুধু।''

''আর সান ফার্নান্ডো ভ্যালি যাওনি ? চাগুয়ানাসে কেনাকাটা করনি ?''

''অবশ্যই। ওটার কথা ভুলি কী করে ? চাগুয়ানাসেই জীবনে প্রথম সোর্ডফিশ খেয়েছিলাম। ফুটফাথের দোকান থেকে আম আর আনারস কিনেছিলাম।''

''ঐ সান ফার্নান্ডো ভ্যালিতেই আমার ছোটবেলা কেটেছে, জান। জন্ম অবশ্য টোবেগোয়। আমার বোনের ইস্কুলে পড়া শেষ হওয়ার পর আমরা পোর্ট অফ স্পেনে চলে যাই।''

''তোমাকে এবার কিন্তু বাঁদিকের লেনে যেতে হবে। সামনের পেট্রল স্টেশনটা পেরিয়ে বাঁদিক নিলেই আমার হোটেল।''

''জানি। ফোনে জিপিএস খোলা আছে। আচ্ছা, জার্ক চিকেন খেয়েছ কখনো ?''

''মিশিগানের একটা শহরে থাকার সময় খেয়েছি বেশ কয়েকবার। বেশ ভাল লেগেছিল। ওটা তো ত্রিনিদাদের রেসিপি নয় ?''

''না, কিন্তু ক্যারিবিয়ান তো। এখানে কাছেই একটা ক্যারিবিয়ান কিচেন আছে। নেটে সার্চ কোরো, পেয়ে যাবে। আচ্ছা চলি।''

পরদিন সকালে একটা সম্পূর্ণ নতুন ফোননম্বর পেলাম ট্যাক্সির। পরিচিত তিনটে নম্বরের একটাও যখন পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে একঘন্টার আগে গাড়ী পাঠাতে পারবেনা বলল, হোটেলের রিসেপশনে ব্যাপারটা জানাতে ওরাই দিল ওটা।

এবার চালক একটা অল্পবয়সী ছেলে, দেখে আরব দুনিয়ার মনে হয় কিন্তু ইংরেজী বলার ধরণ থেকে ঠিক বুঝতে পারলাম না কোন দেশের । পরে ওর গলায় ঝোলানো একটা লকেটের দিকে নজর পড়তে দেখলাম তাতে জর্ডানের বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক আকর্ষণ 'পেট্রা'র ছবি । হতে পারে ছেলেটা সেখানকার অভিবাসী । যাইহোক, আমি কনভেনশন সেন্টারে যাচ্ছি শুনে প্রথমেই প্রশ্ন ''কিসের কন্‌ফারেন্স স্যার ?''

আমার একটু নীরব থাকতে পারলে ভাল হত, মনে মনে নিজের প্রেজেন্টেশন্‌টা ঝালিয়ে নেওয়ার দরকার ছিল । তবু জিজ্ঞেস করছে যখন, বললাম স্ট্যাটিস্টিকাল সায়েন্সের । শুনে জিনিসটা আদৌ কী, খায় না মাথায় দেয় — সেই ধরণের একটা প্রতিক্রিয়া দেখাবে আশা করেছিলাম । ওমা, সটান বলল, ''আচ্ছা । ওটা তো আমার পাঠ্যক্রমে আছে ।''

''মানে ? কোথায় পড় তুমি ?''

''ইউনিভার্সিটি অফ কলোরাডো অ্যাট ডেনভারের আন্ডারে একটা কমিউনিটি কলেজে ।''

''তাই নাকি ? তা এই যে এখন সকালবেলা ট্যাক্সি চালাচ্ছ, ক্লাস নেই ? নাকি কামাই করলে ?''

''না স্যার, আমার সোম আর বুধ বিকেলবেলা ক্লাস, মঙ্গল আর বৃহস্পতি সকালে । পেট চালাবার জন্য কিছু একটা করতে হবে তো । তাই আমার অ্যাকাডেমিক অ্যাডভাইসারের সঙ্গে কথা বলে ক্লাসগুলো ঐরকমভাবে বেছেছি ।''

''বাঃ । আর তোমার পড়ার খরচ ?''

''সেটা তো শুধু ট্যাক্সি চালিয়ে হবেনা স্যার । নীড-বেস্‌ড্‌ স্কলারশিপ আছে কিছুটা, আর বাকীটা লোন । সরকারের থেকে ধার ।''

''বেশ । তোমার বিষয়টা কী ?''

''অ্যাকাউন্টেন্সি । সঙ্গে ইকোনমিক্‌স্‌ মাইনর । দুটোতেই স্ট্যাটিস্টিক্‌স্‌ পড়তে হয় স্যার ।''

''সে তো হবেই । তা পড়াশোনা শেষ হলে কী করবে ? কী ইচ্ছে ?''

''আসলে আমি গ্র্যাজুয়েট করার পর অ্যাকচুয়ারিয়াল মানে ইন্সিওরেন্সের পেশায় যেতে চাই । আপনি প্রোফেসর মানুষ, আপনাকে যখন পেয়েছি স্যার, জিজ্ঞেস করতে পারি ওটার জন্য ঠিক কী কী করতে হয় ?''

''অ্যাকচুয়ারি আমার বিষয় নয়, তবু যতটুকু জানি বলছি । ওটার জন্য ফিনান্সিয়াল ম্যাথম্যাটিক্স, ম্যাথম্যাটিকাল স্ট্যাটিস্টিক্স আর প্রোবাবিলিটি থিওরি জানতে হয় । আধডজন, নাকি তারও বেশী, শক্ত শক্ত পরীক্ষা পাশ করতে হয় । তুমি কি এখানে কোথাও পোস্টগ্র্যাজুয়েট করার কথা ভাবছ ?''

''না স্যার, সেটা পেরে উঠব কিনা জানিনা । তবে আমি যদি এখানকার পড়া শেষ করে দেশে ফিরে যাই, ওখানে আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পোস্টগ্র্যাজুয়েট করার একটা সুযোগ হয়তো হতে পারে ।''

''আমেরিকান ইউনিভার্সিটি ? কোথায় তোমার দেশ ?''

''লেবানন, স্যার । তবে ওখানে মুশকিল হচ্ছে ইন্সিওরেন্সের যাবতীয় যা চাকরি সব রাজধানীতে । বেইরুটের বাইরে আর কিছু নেই ।''

''তুমি বেইরুটে থাক না বুঝি ?''

''না স্যার, আমি থাকি আরও দক্ষিণে, ইজরায়েলি সীমান্তের কাছে ।''

''বাড়ীতে আর কে কে আছেন ?''

রাস্তায় কোনো কারণে সকালের ট্রাফিকজ্যাম ছিলনা আজ। হুহু করে হাইওয়ে দিয়ে গাড়ী পনেরো মিনিটেরও কম সময়ে পৌঁছে গেল গন্তব্যে। আর সেখানে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ বাড়তি একমিনিটও দাঁড়াতে দিলনা কনভেন্শন সেন্টারের সামনের ফুটপাথে। কোনোরকমে আমাকে নাবিয়ে টাকাটা হাতে নিয়েই পালাতে হল ওকে। ফলে ঐ শেষ প্রশ্নের উত্তরটা আর পাওয়া হলনা আমার।

সেদিন সন্ধ্যায় কন্ফারেন্স সেন্টারে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া এক পরিচিত বন্ধু তার ভাড়াগাড়ীতে হোটেলে পৌঁছে দিল আমায়। পরদিন ডেনভারের ট্যাক্সি-পর্বে যবনিকা, বার্ষিক সম্মেলন-শেষে ঘরে ফেরার পালা। যেহেতু আমার ক্লীভল্যান্ডে ফেরার কথা ট্রেনে, তাই এয়ারপোর্টে যাবার ব্যাপার নেই। কনভেন্শন সেন্টার থেকে ডেনভারের রেলস্টেশন খুব কাছে, ট্রামেও যাওয়া যায়। তাই সকাল সকাল হোটেল থেকে মালপত্র নিয়ে শেষবারের মতো ট্যাক্সি চড়ে চললাম কনফারেন্স চত্বরে। এ-শহরে আমার বিশ্বপরিক্রমা শুরু হয়েছিল ৩৩৩-৩৩৩৩ নম্বরটা দিয়ে, কাকতালীয়ভাবে আজও ওটাতেই গাড়ী পেয়ে গেলাম। দরজা খুলতেই ''নমস্তে জী, ক্যায়সে হ্যায় আপ ?'' কাঁচাপাকা চুল, মধ্যবয়সী পোড়খাওয়া চেহারাটা কোথাকার হতে পারে ? উত্তর, পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম ভারতেরই হবে। দক্ষিণ বা পূর্বভারত থেকে তো নয় মনে হচ্ছে।

''হ্যাঁ, নমস্তে, হাউ আর ইউ ?'' অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ হিন্দী টানা বলে যাওয়ার অক্ষমতা আমার দেশে থাকতেই ছিল। এখানে এসেও তার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। তাই মিশ্রভাষাই ভরসা।

''পেমেন্ট ক্যায়সে করেঙ্গে আপ, ক্যাশ অউর কার্ড ?''

''ইয়ে, আপকে পাস কার্ডরীডার তো হ্যায়হি, না ? ডাজ্ ইট ওয়ার্ক ?''

(হেসে) ''অগর আপকো হিন্দী নেহি আতি তো আংরেজীমে বোল সকতে হো। ইয়েস, ইট ওয়ার্কস।''

গাড়ী চলতে শুরু করে। প্রথমদিকের হাল্কা জ্যামটুকু কাটিয়ে হাইওয়েতে উঠেই চালকের প্রশ্ন, ''হুইচ সিটি আর ইউ ফ্রম ?''

''ক্লীভল্যান্ড, ওহায়ো।''

''নেহি জী, ম্যাঁয় আপকে ওয়াতনকা বাত কর রাহা হুঁ।''

''ও, কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল। অউর আপ ? হুইচ সিটি ইন ইন্ডিয়া আর ইউ ফ্রম ?''

''কোয়িভি নেহি।''

''মতলব ?''

''ম্যাঁয় লাহোর কে রহনেওয়ালে থা। নাউ ডেনভার ইজ মাই হোম।''

পাকিস্তানী ড্রাইভার এদেশে এর আগে বড় একটা পাইনি আমি। শেষ পেয়েছিলাম নিউ ইয়র্কের ম্যান্হাটানে, অনেকদিন আগে। কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলাম কতদিন ট্যাক্সি চালাচ্ছেন এখানে। উত্তর এল ''এইট ইয়ার্স্''। তারপর বিনাপ্রশ্নেই যোগ করলেন ''প্রধানমন্ত্রী হবার আগে ইমরান খান কোথায় থাকতেন জানা আছে ? লাহোরের জামান পার্ক বলে একটা জায়গায়। আমার বাড়ী সেখান থেকে বেশী দূরে নয়।''

''ও, আচ্ছা। প্রধানমন্ত্রী হবার আগে ইমরান ভারতে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। অন্ততঃ আমাদের মানে ক্রিকেট ফ্যানদের কাছে।''

''কেন, এখন আর নেই ?''

''নাঃ, এবছর যা সব ঘটনা ঘটল, তারপর মনে হয়না ইমরানের সেইরকম ফ্যান আর কেউ আছে ভারতে ।''

''কোন সব ঘটনার কথা বলছেন জনাব ? তাতে ইমরান খানের কি কসুর ?''

''আপনিও জানেন, আমিও জানি কিসের কথা বলছি । না, আমি বলিনি সেসবের পেছনে ইমরান খানের প্রত্যক্ষ হাত আছে । কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়টা তো ওঁর ওপরই বর্তায় ।''

''আর আপনারা এখন যেটা করছেন কাশ্মীরে ? তার দায় আপনাদের রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর বর্তায় তো ?''

''হ্যাঁ, আমি মনে করি বর্তায় । ওখানে সম্প্রতি যা করা হয়েছে তাতে আপামর ভারতবাসীর একটা বড় আংশের সম্মতি ছিলনা ।''

''হাঃ । আপনি আপনার দেশের খবর রাখেন না জনাব । রাতদিন টিভিতে দেখছি খবরে পড়ছি কাশ্মীরের অসহায় মানুষের ওপর আপনাদের সেনাবাহিনীর বুট আরও জোরে চেপে বসছে আর আপনাদের গণতান্ত্রিক দেশের লোক দুহাত তুলে নাচছে ।''

''আমাদের দেশের জনসংখ্যা একশো তিরিশ কোটী, ড্রাইভারসাব । টিভিতে, কাগজে আর কজনকে দেখেন — তেরশো ? তেরো হাজার ? তেরো লাখ ? ওভাবে মুড়ি-মিছরি এক করাটা ঠিক নয় । ভারতের একশো তিরিশ কোটী লোক কাশ্মীরের সব জমি কিনে নিতে আর সব সরকারী পদ দখল করে নিতে লাইন দিয়ে নেই ।''

''বেশ, তাহলে আপনারা মিছরিরা সব প্রতিবাদ করছেন না কেন ?''

''প্রথমতঃ, কেউ প্রতিবাদ করছে না এ-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত হলেন কী করে ? দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক দেশে আসল প্রতিবাদ হয় ব্যালটে ।''

''তা, ব্যালটে তো আবার তাদেরই ক্ষমতায় আনলেন । এই বছরেই ।''

না, ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে কোনো শীর্ষবৈঠক এই মুহূর্তে হচ্ছেনা । শুধু আমেরিকার রকি পর্বতমালার কোলে এক ছবির মতো শহরের রাস্তায় এক ধাবমান ট্যাক্সিতে দুই রাজনীতিসচেতন ভারতীয় ও পাকিস্তানীর মধ্যে কিঞ্চিৎ মতবিনিময় হচ্ছিল । সেটাও আচমকা বন্ধ হয়ে গেল গন্তব্য এসে যাওয়ায়, দুদেশের অনেক নিস্ফলা শীর্ষবৈঠকের মতোই রয়ে গেল আমীমাংসিত ।

দুঃখ-হতাশা-বেদনা, আশা-স্বপ্ন-আনন্দ, ভালবাসা-ঘৃণা, বিক্ষোভ-সহিষ্ণুতা, হারিয়ে পাওয়া আর পেয়ে হারানো — এই সবকিছু নিয়েই জীবন । কলোরাডোর রাজধানীর ঐ নানারঙের ট্যাক্সিগুলো যেন মাল্টিপ্লেক্স সিনেমাহলের মতো গত পাঁচদিন ধরে আমার চোখের সামনে সেসবের জীবন্ত ছবি এনে হাজির করেছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে । একে যদি বিশ্বপরিক্রমা না বলি তো আর কাকে বলব ?

---

**সুজয় দত্ত** — ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে । কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে । সাহিত্য তাঁর মনের আরাম । গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে । তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন ।

BATAYAN INCORPORATED


AUSTRALIA INC

PORATED, Western Australia
info@batayan.org
+61433022072
www.batayan.org

“এসো, শুধু দৃষ্টি মেলে রাখি ।”

– শঙ্খ ঘোষ